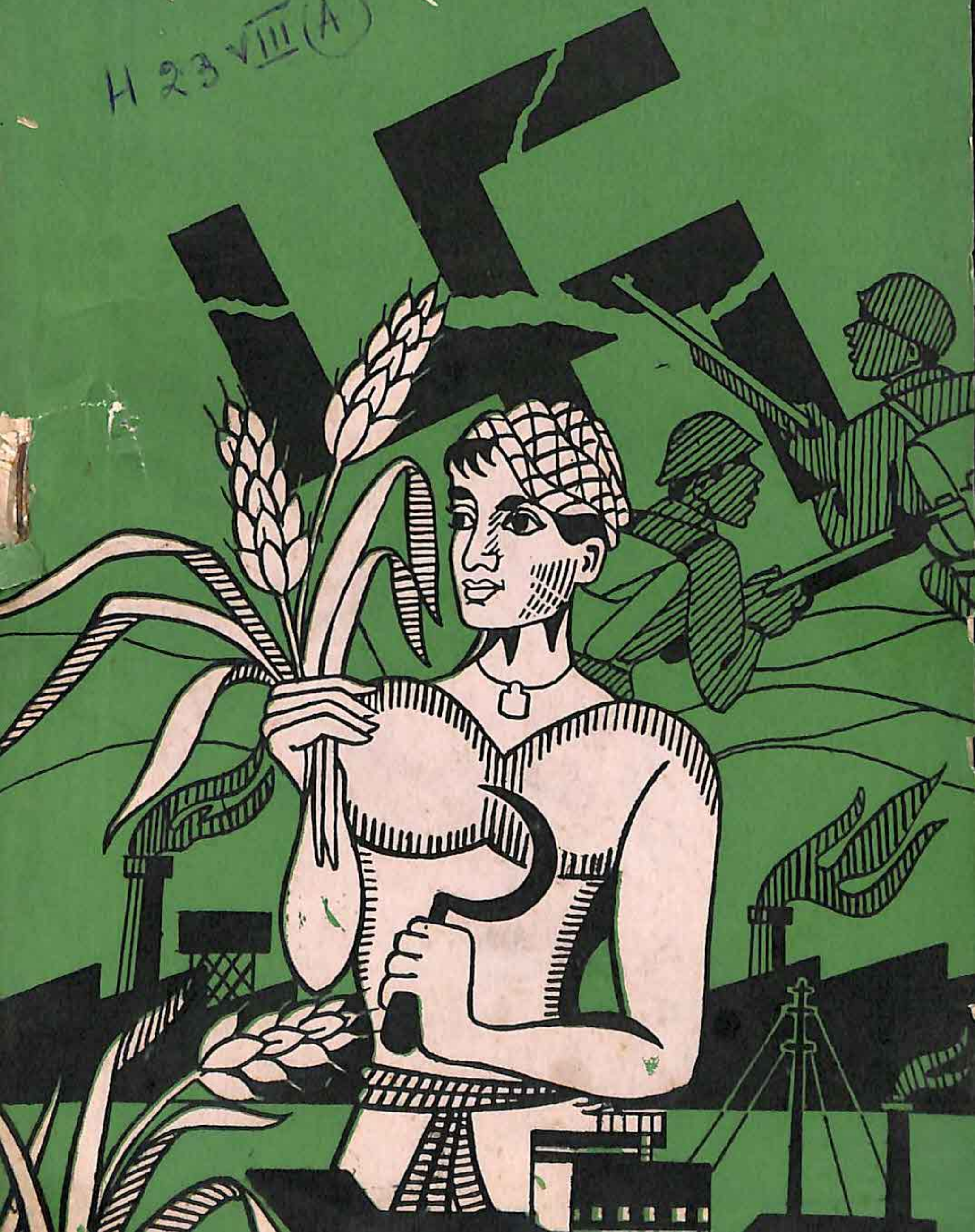
ইতিহাস কথা



4785 / 24.5.90

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক নির্দেশিত নতুন সিলেবাস অনুযায়ী লিখিত
১৯৮৩ শিক্ষাবর্ষ হইতে প্রবর্তিত অষ্টম শ্রেণীর ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তক।
[*Vide Submission No. Syll/H/8/82/78/dated 30.12.82.*]

ইতিহাস কথা

(তৃতীয় ভাগ)

[অষ্টম শ্রেণীর জন্য]

শ্রীবারিক চন্দ্র মাহাতো, এম. এ.,ডিপ-ইন্-বেসিক এডুকেশন্
প্রধান শিক্ষক, শ্রীরামকৃষ্ণ তারকমঠ উচ্চ বিদ্যালয়, পুরুলিয়া।

ও

শ্রীঅসিত কুমার বসু, এম. এ., বি. টি.
শিক্ষক, শ্রীরামকৃষ্ণ তারকমঠ উচ্চ বিদ্যালয়, পুরুলিয়া।

গ্রন্থতীর্থ
ফোন: ৩৪-২৬৫০
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩৩, কলেজ স্ট্রীট • কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক ঃ
এস. বি. নায়ক
গ্রন্থতীর্থ
৬৫/৩এ, কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য ঃ চৌদ্দ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স
৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

॥ আধুনিক যুগ ॥

মানব সভ্যতার ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক কাহিনী হল ইতিহাস। এই ইতিহাসের তিনটি স্তর—প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ। সভ্যতার উত্থান-পতন ও নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়েই একটি যুগের অবসান হয় এবং অপর একটি যুগের আগমন ঘটে। এই ভাবেই মধ্যযুগের পর আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছে। তবে কোন একটা নির্দিষ্ট দিন বা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি যুগের সূচনা হয় এমন বলা যুক্তি সংগত নয়। কারণ এক যুগ থেকে অন্য যুগে পৌঁছতে গেলে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এই পরিবর্তন আসে। মধ্য যুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের পূর্বে ইউরোপে যে নানারূপ পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তার মধ্যে অর্থনৈতিক পরিবর্তন অন্যতম।

ইউরোপের পরিবর্তনশীল অর্থনীতি: মধ্যযুগে ইউরোপে যে সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনীতি প্রচলিত ছিল তার নাম সামন্ততন্ত্র। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার আসল পটভূমি ছিল জমি। এই জমিকে কেন্দ্র করেই ইউরোপে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল। সকলেই ছিল জমির উপর নির্ভরশীল। জমিতে যে সকল জিনিস উৎপন্ন হত তা দিয়েই সকলের প্রয়োজন মিটত। বাইরে থেকে কোন জিনিস আনবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু মধ্যযুগের শেষপর্বে সামন্তপ্রথার অবসান শুরু হয়। ফলে ইউরোপের অর্থনীতির চেহারাও বদলাতে থাকে। এই সময় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচলন হয়। কোন একটি জিনিস না পাওয়া গেলে অন্য স্থান থেকে তা আনিয়ে চাহিদা পূরণ করা হতে থাকে। স্থল পথের চেয়ে জলপথেই ব্যবসা-বাণিজ্য বেশী প্রাধান্য লাভ করেছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে ইউরোপে এক উদীয়মান বণিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। তারা প্রচুর অর্থসম্পদের অধিকারী হয়। মুখ্যতঃ তাদের দ্বারাই ইউরোপের অর্থনীতি পরিচালিত হতে থাকে।

সামন্তপ্রথার অবসান: মধ্যযুগে সামন্ত প্রভুদের অত্যাচার ও করভারে জর্জরিত হয়েও ম্যানরবাসী চাষীরা অর্থাৎ সার্ফগণ পুরুষানুক্রমে

তাদের সেবা করে এসেছে। এদের জীবনে না ছিল কোন স্বচ্ছলতা, না ছিল ভবিষ্যতের কোন সংস্থান। ছিল শুধু অভাব-অনটন ও অত্যাচার। সামন্ত প্রভুদের জমি ছেড়ে পালিয়ে যাবারও কোন উপায় তাদের ছিল না। কিন্তু মধ্য যুগের শেষ দিকে এই সার্ফগণ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে বেশ সচেতন হয়ে ওঠে। সামন্ত প্রথা দুর্বল হয়ে পড়লে তারা অনেকে জমিদারদের নাগপাশ হতে মুক্ত হয়ে শহরে স্বাধীন শ্রমিকের কাজ শুরু করে। অনেকে আবার ইউরোপে ধর্মযুদ্ধ চলার সময় জমিদারদের জায়গা (ম্যানর) ছেড়ে পালিয়ে শহরে চলে যায়। এমনি করেই একদিন সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটে।

কৃষি প্রণালীর উন্নয়ন ঃ সামন্ততন্ত্রের অবসানের যুগে কৃষি ব্যবস্থাতে এক ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায়। অনেক জমিদার তাদের জমি চাষের জন্য চুক্তির ভিত্তিতে কৃষক সমাজের উপর ছেড়ে দিতে থাকে। এই সময় জমির উপর বিশেষ নজর দিতে দেখা যায় এবং কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি শুরু হয়। পুরাতন পদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে উন্নত পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ চলতে থাকে। পূর্বে যে সমস্ত জমি চাষের অনুপযুক্ত ছিল এই সমস্ত জমিতে চাষ-আবাদের ব্যবস্থা করা হয়। ভুট্টা, বার্লি প্রভৃতি ফসলের উৎপাদন পূর্বের তুলনায় প্রচুর বৃদ্ধি পেল। আখ, কমলালেবু, আখরোট প্রভৃতি ফলের চাষ শুরু হল। আমেরিকা থেকে আলু এনে ইউরোপে তার ...স করা হল। মধ্যযুগে কৃত্রিম সারের ব্যবহার ছিল খুব কম। পরে অধিক ফসলের আশায় নানারকম কৃত্রিম সারের ব্যবহার শুরু হল। এই সময় চাষের কাজে শক্তিশালী বলদ নিযুক্ত করা হয়। এরা লোহার লাঙ্গল টানত। ফলে ভূমি কর্ষণ পূর্বের চেয়ে অনেক উন্নত হয়। এমন কি বায়ুচালিত কলের সাহায্যে চাষের জমিতে জল দেবারও ব্যবস্থা হয়। ফলে একই জমিতে বছরে একাধিকবার ফসল উৎপন্ন হতে থাকে।

শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন নতুন ফসলের অবদান ঃ নতুন পদ্ধতিতে কৃষিকার্য করে ভুট্টা, আখ, আলু, কমলালেবু প্রভৃতি নতুন নতুন ফসলের যেমন উদ্ভাবন হল, তেমনি ঐ সকল ফসল ভিত্তিক নতুন নতুন শিল্পও গড়ে উঠতে লাগল। যেমন, আখের চাষের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চিনি

শিল্পেরও ব্যাপক প্রসার হল। এই রকমের আরও নানারকম শিল্প গড়ে উঠল। এই সময়ে পণ্য-সামগ্রী প্রেরণের উদ্দেশ্যে বড় বড় জাহাজ নির্মাণ শিল্পেরও প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল।

এভাবে ইউরোপে সমাজ, কৃষি ও শিল্পের দিক থেকে এক আমূল পরিবর্তন ঘটল। এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই জন্ম নিল আধুনিক যুগ। মানব সভ্যতার চেহারা বেশ বদলে গেল।

অনুশীলনী

নিবন্ধমূলক প্রশ্ন

১। আধুনিক যুগের প্রারম্ভে ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থার কিরূপ পরিবর্তন হয়েছিল তার উল্লেখ কর।

২। এই সময়ে শিল্পোন্নয়নে নতুন নতুন ফসলের অবদান বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। কিভাবে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটে?

২। আধুনিক যুগের শুরুতে কৃষি ব্যবস্থার কি পরিবর্তন এসেছিল?

৩। এই সময়ে শিল্প ক্ষেত্রে কিরূপ উন্নতি হয়েছিল?

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরের পাশে ✓ চিহ্ন দাও ঃ

(ক) সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার আসল পটভূমি ছিল অর্থ/ভূমি।

(খ) সামন্ত প্রভুদের অধীনে সার্ফগণ খুব দুঃখে/সুখে জীবন যাপন করত।

(গ) ইউরোপে আলু চাষ শুরু হল আফ্রিকা/আমেরিকা থেকে আলু এনে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ ইউরোপের নবজাগরণ ॥

(ক) **নবজাগরণ কথার অর্থ :** 'রেনেসাঁস' কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল 'নবজাগরণ'। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীদের দ্বারা কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের ফলে সেখানকার সাংস্কৃতিক জীবন একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। বহু গ্রীক পণ্ডিত তাঁদের পুঁথি-পত্র নিয়ে কনস্ট্যান্টিনোপল থেকে পালিয়ে পশ্চিম ইউরোপে চলে আসেন। তাঁদের আগমনে এই সময়ে বিশেষ করে ইটালী দেশে প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার চর্চা নতুনভাবে আরম্ভ হয়। এইভাবে ইউরোপের মানুষের চিন্তাধারায় এক বিরাট আলোড়ন জাগে। তাঁদের চিন্তাধারার এই আলোড়নকেই বলা হয় নবজাগরণ।

নবজাগরণের স্বরূপ : সারা ইউরোপ জুড়ে নবজাগরণের এই বিরাট আলোড়ন একদিনেই সম্ভব হয়নি। মধ্যযুগ শেষ হওয়ার বহু আগে থেকেই ইউরোপে নবজাগরণের ক্ষেত্র তৈরী হয়েছিল। তবে মধ্যযুগের শেষভাগেই যে পশ্চিম ইউরোপের অধিবাসীদের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে সময়ে ইউরোপের তীক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন পণ্ডিতেরা ধর্মতত্ত্ব নিয়ে নানা যুক্তির অবতারণা করতেন। মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ধর্মতত্ত্ব প্রধান স্থান পেয়েছিল। চার্চের মত-বিরোধী কোন শিক্ষাই সেখানে দেওয়া হত না। তা হলেও বিশ্ব বিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠন, তর্ক, আলোচনা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে মানুষের মনে নতুন আলো প্রবেশ করত এবং তার ফলে মধ্যযুগের অন্ধকার অনেকটা কেটে যায়। ক্রুসেডের ফলে প্রাচ্য দেশের সংস্পর্শে এসে তাদের জ্ঞান স্পৃহা আরও বৃদ্ধি পায়। এইভাবেই সেখানে স্বাধীন চিন্তার প্রসার ঘটে এবং নবজাগরণের পথ উন্মুক্ত হয়।

নবজাগরণ ইউরোপবাসীদের চিন্তার জগতে এক বিরাট বিপ্লব এনেছিল। মধ্যযুগে মহামান্য চার্চ ও পোপের নির্দেশ কেউ লঙ্ঘন করতে পারত না। যাজক শ্রেণীর ব্যক্তিরা সাধারণ লোকদের অন্ধভাবে চার্চকে মান্য করতে শেখাতেন ; সংসারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ ত্যাগ করে তাদের পরলোকের চিন্তা করতে বলতেন। তাঁরা মানুষকে শেখাতেন যে

জাগতিক যত ক্রিয়া কাণ্ড, প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সব কিছুই ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ; এসব তাঁরই কাজ। সাধারণ মানুষ কোনরকম প্রশ্ন না তুলে নির্বিবাদে চার্চের এসব নির্দেশ মেনে চলত। কিন্তু নবজাগরণের ফলে এই অন্ধ সংস্কারের যুগের সমাপ্তি ঘটল। এযুগের মানুষ অতীতের অন্ধ সংস্কার আর মানতে চাইল না ; যাজকদের কথার উপর আর তারা বিশ্বাস রাখতে পারল না। জীবনের বহু বিষয়ে তাদের অনুসন্ধিৎসা জেগে উঠল। তারা অজানাকে জানতে চাইল। তারা যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে সব জিনিসকে বিচার করতে শিখল। তারা আর পরলোকের চিন্তায় কিংবা পাপ-পুণ্যের ধ্যান-ধারণায় মগ্ন থাকতে চাইল না। তারা স্বাভাবিক, সুস্থ এবং আনন্দময় জীবন যাপনের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। এখন থেকে দেহ ও মনের উন্নতি সাধনই হল তাদের জীবনের উদ্দেশ্য। তারা গ্রীক ও রোমের শিক্ষা-সংস্কৃতিকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকতে চাইল। গ্রীক ও রোমানদের সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান এবং তাদের ভাবধারার প্রতি এযুগের মানুষের আগ্রহ ও শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। এইভাবে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনই নবজাগরণের পথ প্রশস্ত করে।

(খ) **নবজাগরণে ইটালীর নেতৃত্বদান :** নবজাগরণের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে ইটালীতে। মধ্যযুগের শেষভাগে ইটালীতে ফ্লোরেন্স, মিলান, পিসা, জেনোয়া, ভেনিস, রোম প্রভৃতি নগর-রাষ্ট্র ছিল। এই শহরগুলি শিল্প ও বাণিজ্যে খুব উন্নত ছিল। ক্রুসেডের সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করে এই শহরগুলির বণিক শ্রেণী খুব ধনশালী হয়। তারা বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এছাড়াও তারা সুন্দর সুন্দর ছবি, প্রাসাদ ও শিল্পকার্য খুব পছন্দ করতেন। তাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে সেখানকার শিল্পগুলি খুব উৎকর্ষ লাভ করেছিল।

আবার কনস্ট্যাণ্টিনোপলের পতনের পর যেসব গ্রীক পণ্ডিত ইউরোপে আসেন তাঁরাও ইটালীর শহরগুলিতে সমাদর পান। এইসব শিল্পী ও পণ্ডিতদের আগমনে ইটালীর শহরগুলি সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই ভাবেই সেখানে নবজাগরণের প্রথম বিকাশ ঘটে।

ক্রমে এই শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারা আল্পস পর্যন্ত অতিক্রম করে ইটালী থেকে জার্মানী, ফ্লান্ডার্স, নেদারল্যাণ্ড, পর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে ইউরোপে শুরু হয় নবজাগরণের যুগ।

(১) চিন্তার ক্ষেত্রে নবজাগরণ বা মানবতাবাদ ঃ—সেযুগে গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের সমঝদার পণ্ডিতদের বলা হত হিউম্যানিস্ট বা মানবতাবাদী, আর তাঁদের চিন্তাধারাকে বলা হত মানবতাবাদ। 'হিউম্যানিস্ট' কথাটি এসেছে ল্যাটিন 'Homo' কথাটি থেকে—যার অর্থ হল মানুষ। মানুষের প্রকৃত মর্যাদায় মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করা, মানবজাতির মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করা—প্রভৃতি ছিল মানবতাবাদী মনীষীদের জীবনের একমাত্র ব্রত। মানুষের উন্নতির জন্য তাঁরা ধর্ম নিরপেক্ষ জ্ঞান বৃদ্ধির চেষ্টা করতেন। তাঁরাই দেশীয় ভাষায় সাহিত্য, কাব্য ও নাটক রচনায় অগ্রণী হন। তাঁদের চেষ্টায় আঞ্চলিক মাতৃভাষার উন্নতি হয়।

নবজাগরণ যুগের প্রারম্ভে ইটালীর কবি দান্তে দেশীয় কথ্য ভাষায় 'ডিভাইন কমেডি' নামে একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করে যশস্বী হয়েছেন। তিনি সর্বপ্রথম ইটালীয় কথ্য ভাষায় বই লেখার পথ দেখান।


পেত্রার্ক

পেত্রার্ক ছিলেন হিউম্যানিস্টদের মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। তিনি ইটালীয় ভাষায় কয়েকটি উৎকৃষ্ট সনেট রচনা করেন। পেত্রার্কের সাহিত্য ও শিল্প প্রীতিতে মুগ্ধ হয়ে বহু বিদ্যার্থী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। ফলে বহু যুবক আইন, ধর্মনীতি প্রভৃতি মধ্যযুগীয় শিক্ষা ছেড়ে দিয়ে পেত্রার্কের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এই সময়ে প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য আলোচনা করতে তাঁর প্রবল আগ্রহ জন্মে। কিন্তু গ্রীক ভাষা তিনি ভাল করে শিখতে পারেননি। কথিত আছে, তিনি গ্রীক ভাষায় রচিত হোমারের রচনাবলী নিজের কাছে রাখতেন। তিনি এর ভাষা বুঝতেন না বটে, কিন্তু শ্রদ্ধার সঙ্গে ঐ পুস্তকগুলি চুম্বন করতেন।

পেত্রার্ক ইউরোপের নানা স্থানে প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন পুঁথির সন্ধানে ভ্রমণ করেন এবং লিপিকারের সাহায্যে বহু পুঁথি নকল করিয়ে নেন। গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য প্রচারের জন্য তাঁর নাম ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।

ইতিহাস ও রাজনীতি আলোচনায় এই সময়ে নতুন যুগের চিন্তাধারা প্রবর্তন করেন মেকিয়াভেলি। তাঁর রচিত 'ফ্লোরেন্সের ইতিহাস' একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কিন্তু 'দি প্রিন্স' নামক গ্রন্থ রচনা করেই তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন। এই গ্রন্থে তিনি রাজনীতি সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা করেন। দেশের উন্নতির জন্য ক্ষমতাসম্পন্ন শাসক ন্যায়-অন্যায় যে কোন নীতি অবলম্বন করতে পারেন—এই ছিল মেকিয়াভেলির মতবাদ। তাঁর ধারণা ছিল রাজনীতির ক্ষেত্রে ন্যায় অন্যায় বলে কিছু নেই। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি যে ঐ যুগে জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম বৃদ্ধি করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এই সময়ে ইটালীর আর একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ছিলেন বোকাচিচও। তিনি তাঁর বন্ধু পেত্রার্কের পরামর্শে গ্রীক ভাষা শিক্ষা করে ইটালীতে গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি 'ডেকামেরণ' নামে একখানি ইটালীয় গল্পগুচ্ছ রচনা করেন।


ফ্রান্সিস্ বেকন্

নবজাগরণের আন্দোলন ক্রমে ক্রমে পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়ে ইংলণ্ডের একজন চিন্তাশীল দার্শনিক ছিলেন ফ্রান্সিস্ বেকন্। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রতিটি ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে বেকন সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করেন। তাঁকে 'পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের জনক' বলা হয়ে থাকে। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'নোভাম অর্গ্যানাম' (নব প্রণালী) সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তিনি সকলকে গতানুগতিকতা, অন্ধবিশ্বাস প্রভৃতি পরিত্যাগ করতে উপদেশ দেন। তাঁর সংস্কারমুক্ত ও দূরদর্শী মন ইংলণ্ডে নবজাগরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।

এই যুগে ইংলণ্ডের একজন প্রসিদ্ধ কবি হলেন চসার। তিনি ইংরাজী ভাষায় 'ক্যাণ্টারবেরি টেলস্' (ক্যাণ্টারবেরির কাহিনী) রচনা করে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন।

ইংলণ্ডের আর এক কবি এডমণ্ড স্পেন্সার 'ফেয়ারী কুইন' নামক বিখ্যাত কবিতার বই লিখে মানুষকে আনন্দ দিয়েছেন। শেষ বয়সে তিনি আয়ার্ল্যাণ্ড সম্পর্কে গদ্য সাহিত্যও রচনা করেছিলেন।

রাণী এলিজাবেথের যুগে ইংলণ্ডে আবির্ভূত হন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও ইংরাজী সাহিত্যের দিকপাল **শেক্সপীয়ার**। তাঁর রচিত 'হ্যামলেট,' 'ম্যাকবেথ', 'মারচেণ্ট অফ ভেনিস', 'ওথেলো', 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' প্রভৃতি নাটক আজও অমর হয়ে আছে।


শেকস্পীয়ার

ডেসিডেরিয়াস ইরাসমাস ছিলেন হল্যাণ্ডের বিখ্যাত লেখক। তিনি যাজক হওয়া সত্ত্বেও লেখক হিসাবে বেশী পরিচিত ছিলেন। তিনি কুসংস্কারে নিমজ্জিত ধর্মযাজকদের বিদ্রূপ করতেন।

এই যুগে 'ডন কুইক-জোট্' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা স্পেনীয় লেখক সারভান্তিসের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন আধুনিক উপন্যাসের অগ্রদূত। স্পেনে তিনিই নবজাগরণের সূচনা করেন।

নবজাগরণের যুগে ফ্রান্সও পিছিয়ে পড়েনি। সেখানে ফরাসী ভাষায় নাটক, কবিতা, গদ্য সাহিত্য রচিত হতে থাকে। **রাবেলে** ছিলেন ফ্রান্সেরই একজন গুণী লেখক। তাঁর রচিত বইয়ের নাম 'গারগানতুয়া'। এই বইতে তিনি হাস্য-কৌতুকের অবতারণা করেছেন। তিনি সাহিত্য রচনায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন।

(২) **শিল্পের ক্ষেত্রে নবজাগরণ :** চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও এই সময়ে নতুন যুগের সৃষ্টি হয়। মধ্যযুগে শিল্পে শুধুমাত্র পাপ-পুণ্য ও ধর্মীয় মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু এই যুগের শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মানুষ ও তার বাস্তব জীবনকে পরিস্ফুট করা।

লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি হলেন এই যুগের ইটালীর একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী, ভাস্কর ও স্থপতি। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তাঁর অঙ্কিত 'দি লাস্ট সাপার' (শেষ ভোজ), 'মোনালিসা' প্রভৃতি চিত্র জগতের শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলির মধ্যে স্থান পেয়েছে। তাঁর চিত্রগুলি ছিল নবজাগরণের প্রতীক স্বরূপ।



মোনালিসা

রাফায়েল ছিলেন এই-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তিনি তাঁর স্বল্প-পরিসর জীবনের অসংখ্য সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকেছেন। পোপের প্রাসাদের কয়েকটি প্রাচীর চিত্র ও ম্যাডোনার কয়েকটি সুন্দর ছবি রাফায়েলের নাম চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।



এঞ্জেলোর নির্মিত মোজেসের মূর্তি

মাইকেল এঞ্জেলো ছিলেন ইটালীর ফ্লোরেন্সের অধিবাসী। তিনি একজন বিখ্যাত চিত্রকর, স্থপতি ও ভাস্কর। পাথর কেটে মূর্তি নির্মাণ করতে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। তিনি পৃথিবীর অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ মর্মর মূর্তি নির্মাণ করেছেন। অনেক সুন্দর সুন্দর চিত্রও তিনি অংকন করেছেন। রোমের সেন্টপিটার গীর্জা নির্মাণের

ক্ষেত্রেও তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। তাঁর অঙ্কিত 'শেষ বিচার' চিত্রখানি শিল্প ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ।



সেন্টপিটার গীর্জা

(৩) বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবজাগরণ :—মধ্যযুগে বিজ্ঞান চর্চাকে যাজক সম্প্রদায় বিশেষ সুনজরে দেখতেন না। কিন্তু নবজাগরণের যুগে সাহিত্য ও শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে বিজ্ঞানও এক নতুন স্তরে এসে পৌঁছায়।

ইংরাজ পণ্ডিত রোজার বেকনের আবির্ভাব ঘটে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। তাঁকে 'আধুনিক বিজ্ঞানের জনক' বলা হত। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের উপর তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তিনি সে যুগেই বলেছিলেন যে ভবিষ্যতে যন্ত্রচালিত জাহাজ, গাড়ী প্রভৃতি তৈরী করা সম্ভব হবে এবং মানুষ একদিন আকাশে ভ্রমণ করবে। তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি যে কতটা তীক্ষ্ন এ থেকেই অনুমান করা যায়।

এলিজাবেথের যুগে ইংলণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ছিলেন ফ্রান্সিস বেকন। তাঁর সাহিত্যচর্চার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি আগেকার বিজ্ঞানকে কার্যকরী রূপ প্রদান করেন।

ফ্লোরেন্সের লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি শুধু শিল্পী হিসাবেই বিখ্যাত ছিলেন না, তিনি এই যুগের একজন বৈজ্ঞানিকও ছিলেন। পূর্তবিদ্যা ও নতুন যন্ত্রের আবিষ্কার প্রভৃতিতে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি আকাশে ভ্রমণ করবার জন্য এরোপ্লেনের পরিকল্পনা করেছিলেন। লোকেরা তাঁকে যাদুকর বলে ভাবত।

এই যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কোপারনিকাসের নাম বিশেষ-

ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন যুগের লোকেরা মনে করত যে পৃথিবী সৌরজগতের কেন্দ্রস্থল। সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র সবকিছুই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু কোপারনিকাস নামে পোল্যাণ্ডের একজন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করলেন যে পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে না। এভাবে তিনি মধ্যযুগের জ্যোতির্বিদদের ধারণা যে ভুল তা প্রমাণ করলেন। কিন্তু তাঁর এই অভিমতের বিরুদ্ধে তখন সকলেই প্রতিবাদ করেছিল।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারক ছিলেন ইটালীর বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও। তিনি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সৌরজগতের অনেক তথ্য জানতে পারেন। তিনি কোপারনিকাসের মতবাদ প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করে দেখান যে পৃথিবীই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু ধর্ম-যাজকগণ তাঁর কথা মানতে অস্বীকার করলেন। ফলে ধর্মযাজকদের বিচারসভার সামনে তাঁকে উপস্থিত হতে হয়। বিচারে তিনি দোষী সাব্যস্ত হন। নতুন মত প্রকাশের জন্য তাঁকে আজীবন প্রায় বন্দীশালায় জীবন কাটাতে হয়েছিল।



গ্যালিলিও

সভ্যতার ইতিহাসে নবজাগরণের যুগে আর একটি কীর্তি হল মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার। গুটেনবার্গ নামে জার্মানির একজন ব্যক্তি এই যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। শিক্ষা বিস্তারে মুদ্রাযন্ত্র যথেষ্ট সাহায্য করে। মধ্যযুগে লিপিকারদের পুঁথি নকল করা হত। তাতে প্রায়ই ভুল থাকত। তাছাড়া লিপিকারদের সাহায্যে পুঁথি নকল করা খুব ব্যয়সাধ্য ও শ্রমসাধ্যও ছিল। সে সময়ে গরীবদের পক্ষে পুঁথি সংগ্রহ করা খুব কষ্টকর ব্যাপার ছিল। কিন্তু নবজাগরণের যুগে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে অল্প সময়ে এবং অল্প খরচে অসংখ্য পুস্তক প্রকাশিত হতে লাগল। এর ফলে জগতের জ্ঞান ভাণ্ডার বৃদ্ধি হল।

কালক্রম	
দান্তে	১২৬৫—১৩২১ খ্রীঃ
পেত্রার্ক	১৩০৪—১৩৭৪ খ্রীঃ
ইরাসমাস	১৪৬৬—১৫৩৭ খ্রীঃ
লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি	১৪৫২—১৫১৯ খ্রীঃ
মাইকেল এঞ্জেলো	১৪৭৫—১৫৬৪ খ্রীঃ
রাফায়েল	১৪৮৩—১৫২০ খ্রীঃ
রাবেলে	১৪৯৮—১৫৫৩ খ্রীঃ
উইলিয়াম শেক্‌স্‌পীয়ার	১৫৬৪—১৬১৬ খ্রীঃ

অনুশীলনী

নিবন্ধমূলক প্রশ্ন

১। 'নবজাগরণ' কথাটির অর্থ কি ? এর স্বরূপগুলি আলোচনা কর।

২। ইটালীতে নবজাগরণ প্রথম আরম্ভ হয়েছিল কেন ?

৩। নবজাগরণ যুগে মানবতাবাদ কিভাবে প্রচারিত হয়েছিল ? তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৪। নবজাগরণ যুগে শিল্পের বৈশিষ্ট্য কি ছিল ? এই যুগের শিল্পের কিরূপ উন্নতি হয়েছিল তা লেখ।

৫। নবজাগরণ যুগে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্বন্ধে কি জান ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। কোন্‌ সময়ে ইউরোপ নবজাগরণের সূত্রপাত হয় ?

২। নবজাগরণ প্রথমে কোথায় প্রকাশ লাভ করে ? পরবর্তীকালে তা কোন্‌ কোন্‌ দেশে ছড়িয়ে পড়ে ?

৩। নবজাগরণ যুগের কয়েকজন মানবতাবাদীর নাম উল্লেখ কর।

৪। নবজাগরণ যুগের কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পীর নাম কর।

৫। কোপারনিকাস ও গ্যালিলিও সম্পর্কে কি জান ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরটির পাশে ✓ চিহ্ন দাও ঃ

(ক) 'ডিভাইন কমেডি' রচনা করেছেন পেত্রার্ক/দান্তে।

(খ) 'দি প্রিন্স' নামক গ্রন্থটি লিখেছেন মেকিয়াভেলি/ফ্রান্সিস বেকন।

(গ) 'ডেকামেরণ' নামক গ্রন্থটি লেখেন বোকাচ্চিও/স্পেন্সার।

(ঘ) 'ক্যান্টার বেরি টেলস' লিখেছেন ইরাসমাস/চসার।

(ঙ) 'মোনালিসা' চিত্রটি অংকন করেন রাফায়েল/লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি।

(চ) মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার করেন গুটেনবার্গ/গ্যালিলিও।

॥ ইউরোপীয় জগতের পরিধি বিস্তার ॥

সূচনা ঃ নতুন দেশ আবিষ্কারে পরিবর্তিত অর্থনীতি ও নবজাগরণের প্রভাব ঃ—ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসে নবজাগরণের দান অপরিসীম। নবজাগরণের ফলে জগতের অজানা অংশের দরজাও ধীরে ধীরে সাহসী ইউরোপীয়দের নিকট উন্মুক্ত হতে লাগল। দেখা দিল ভৌগোলিক আবিষ্কারের প্রতি তাদের উৎসাহ। এই সময়ে এশিয়ার মশলা ও বিলাসদ্রব্য ছিল ইউরোপীয়দের নিকট বহু আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। কেননা ইউরোপের বাজারে এইগুলির খুব চাহিদা ছিল। তাই তারা এশিয়ায় আগমনের নতুন বাণিজ্য পথের সন্ধান করতে আরম্ভ করে।

সমুদ্র যাত্রায় বাধা-বিঘ্ন কম ছিল না। কিন্তু নবজাগরণের প্রভাবে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে এইসব বাধা-বিঘ্নও দূর হল। এই সময়ে শিক্ষিত লোকের মনে ধারণা জন্মায় যে পৃথিবী আকারে গোল। উন্নত দিগ্‌নির্ণয়কারী যন্ত্র কম্পাস আবিষ্কারের ফলে নাবিকদের অকূল সমুদ্রে পথ হারিয়ে ফেলার আর কোন ভয় রইল না। সমুদ্র-পথের মানচিত্র এবং অ্যাস্ট্রোলেব নামক যন্ত্রের সাহায্যে তারা জানতে পারল বিষুবরেখা থেকে কোন্ স্থান কত দূরে এবং কোন্ দিকে অবস্থিত। এইভাবে ধীরে ধীরে সব দেশের নাবিকদের নিকট সমুদ্রযাত্রা সহজ হয় এবং নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার করতে তারা দারুণ উৎসাহী হয়ে ওঠে।

পর্তুগীজদের সামুদ্রিক অভিযান

রাজপুত্র হেনরী ঃ জলপথে নতুন দেশ আবিষ্কারের চেষ্টায় পর্তুগীজরাই ছিল অগ্রণী। পর্তুগালের রাজপুত্র নাবিক হেনরী পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম উপকূল সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ভাবে কিছুটা জ্ঞান লাভ করেন। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণখ্রীষ্টান। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলবাসী মুসলমানদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার উদ্দেশ্যেই তিনি অভিযান করেছিলেন। তিনি আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের অনেকখানি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন।

বার্থোলোমিউ ডিয়াজ : ১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্থোলোমিউ ডিয়াজ নামে একজন পর্তুগীজ নাবিক আফ্রিকার দক্ষিণ সীমায় উপস্থিত হন। সেখানকার আবহাওয়া খুব খারাপ ছিল। তাই তিনি ঐ স্থানের নাম দেন 'ঝড়ের অন্তরীপ'। কিন্তু পর্তুগালের রাজা এর নতুন নামকরণ করেন 'উত্তমাশা অন্তরীপ'। কেননা এখান থেকে প্রাচ্য দেশগুলিতে যাওয়া সম্ভব হবে বলে তাঁর মনে আশার সঞ্চার হয়।



ভাস্কো-দা-গামা

ভাস্কো-দা-গামা : ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত নাবিক ভাস্কো-দা-গামা পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে যাত্রা করে উত্তমাশা অন্তরীপ পার হয়ে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে জাঞ্জিবারে এসে পৌঁছিলেন সেখান থেকে তিনি সরাসরি সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ভারতের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে এসে উপস্থিত হন (১৪৯৮ খ্রীঃ)। এইভাবে দীর্ঘ দিন পর ইউরোপ থেকে জলপথে ভারতে আসার পথ তিনিই প্রথম আবিষ্কার করলেন।

কেব্রাল : ভাস্কো-দা-গামার পর ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে পেড্রো কেব্রাল নামে আর একজন পর্তুগীজ নাবিক প্রচুর পণ্য সামগ্রী নিয়ে ভারতে আসেন। তিনি কালিকটে একটি বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে স্বদেশে ফিরে যান।

আলবুকার্ক : ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামা যখন দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আসেন তখন তিনি কোচিনে আর একটি বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে যান। তখন থেকেই পর্তুগীজরা এদেশে রীতিমত ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে দেয়। এই বাণিজ্য কুঠিগুলির তত্ত্বাবধানের জন্য ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে আলফানসো আলবুকার্ক এদেশে গভর্ণর নিযুক্ত হয়ে আসেন। ক্রমে ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়।

কলম্বাস : পর্তুগালের মত স্পেনের নাবিকগণও নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার করতে উদ্যোগী হয়। এই সময়ে ইটালীর জেনোয়া শহরে কলম্বাস নামে একজন বিখ্যাত নাবিক ছিলেন। টলেমির ভূগোল পাঠ করে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকলেই ভারতবর্ষে পৌঁছান যাবে। এই সমুদ্র যাত্রায় স্পেনের রাজা ফার্ডিনান্ড এবং রাণী ইসাবেলা কলম্বাসকে তিন খানি ছোট জাহাজ ও প্রায় একশ' সংগী দিয়ে সাহায্য করেন। কলম্বাস আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হয়ে ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে বাহামা দ্বীপপুঞ্জে অবতরণ করেন। কলম্বাস এই অঞ্চলকে ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ বলে মনে করেছিলেন। তাই এই দ্বীপপুঞ্জ এবং আশে পাশের দ্বীপগুলির নাম দেওয়া হয়েছিল 'ইণ্ডিজ' এবং এখানকার অধিবাসীদের বলা হত 'ইণ্ডিয়ান'। আজও এই দ্বীপগুলি 'ওয়েস্ট ইণ্ডিজ' নামে পরিচিত। কলম্বাস তখনও জানতেন না যে এই নতুন মহাদেশটি আমেরিকা।



কলম্বাস

আমেরিগো ভেসপুচি : ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিগো ভেসপুচি নামে স্পেনের আর একজন নাবিক দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলে এসে উপস্থিত হন। এই স্থানটির আবিষ্কার সম্পর্কে তিনি একটি বিবরণী প্রকাশ করেন। তখন লোকের ধারণা হল যে আমেরিগো-ই বুঝি এই নতুন মহাদেশটি আবিষ্কার করেছেন। তাই তাঁর নামানুসারে সেই নতুন মহাদেশের নাম হয় আমেরিকা।

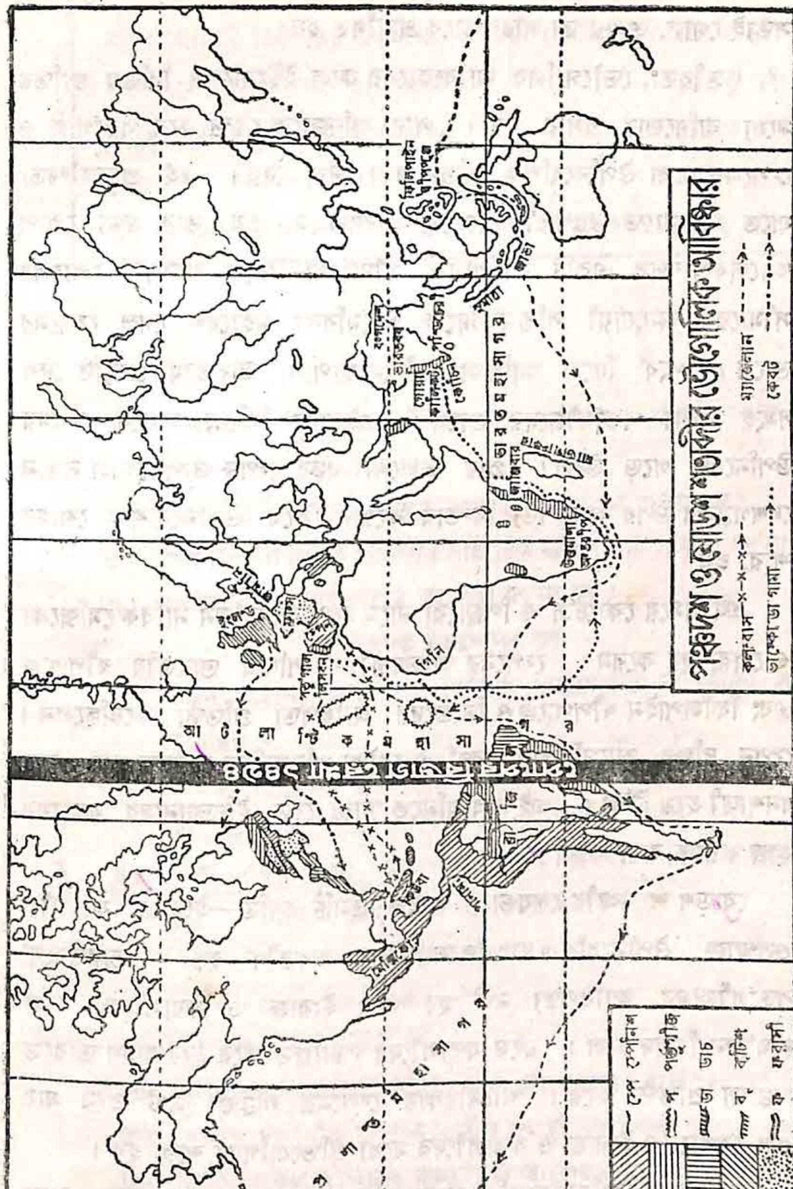
বালবোয়া : ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে বালবোয়া নামে একজন স্পেনবাসী নাবিক আমেরিকার পানামা যোজক অতিক্রম করেন এবং সেখান থেকে অপরিচিত প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে যাত্রা করেন।

ম্যাগেলান : ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাগেলান নামে একজন নাবিক স্পেন সরকারের সাহায্য নিয়ে পাঁচখানি জাহাজ সংগে করে মশলা দ্বীপের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। তিনি আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হয়ে দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরে প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশ করেন এবং এক সুন্দর শস্য শ্যামল দ্বীপে উপস্থিত হন। তিনি স্পেনের রাজকুমার ফিলিপের নামে ঐ স্থানের দ্বীপগুলির নাম রাখলেন—ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। এই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের সহিত এক সংঘর্ষে ম্যাগেলান নিহত হন। তাঁর সংগীদের মধ্যে কয়েকজন একটি মাত্র জাহাজে ভারত মহাসাগর পার হয়ে আফ্রিকা ঘুরে তিন বছর পরে দেশে ফিরে আসে। তারাই সমুদ্রপথে প্রথম ভূ-প্রদক্ষিণ করেছিল।


ম্যাগেলান

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলাফল : ইউরোপের নাবিকদের দ্বারা পৃথিবীর নতুন নতুন দেশ ও সমুদ্র পথ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে মানুষের ভৌগোলিক জ্ঞান দারুণ ভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে নতুন নতুন বাণিজ্য কেন্দ্রের প্রসার ঘটে। তাছাড়া ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে নতুন মহাদেশের প্রাচীন সভ্যতার কথাও জানা যায়। আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা 'রেড ইন্ডিয়ান' নামে পরিচিত। তাদের প্রাচীন সভ্যতার নাম 'মায়া সভ্যতা'। মায়া সভ্যতার বহু নিদর্শন, যেমন—প্রাচীন নগর ও মন্দির প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ সেখানে পাওয়া গেছে। এখানকার প্রাচীন অধিবাসীরা পাথরের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত। তাদের নির্মিত পাথরের বাড়ীগুলিও বেশ সুন্দর ছিল। তারা লোহার ব্যবহার জানত না। পেরু দেশের ইনকা জাতির লোকেরাও সুসমৃদ্ধ রাজধানী গড়ে তুলেছিল।

দ্বিতীয়তঃ, ম্যাগেলান এবং আরও পরে ড্রেক প্রমুখ নাবিকদের অভিযানের


পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ভৌগোলিক আবিষ্কার
কলম্বাস ×-×-×->
ভাস্কো-ডা-গামা ·······>
ম্যাজেলান -------->
কেবট -·-·-·->
স্পে স্পেনিশ
প পর্তুগীজ
ডা ডাচ
ব্ বৃটিশ
ফ ফরাসী
পোপের বিভাগ রেখা ১৪৯৪
ভারত মহাসাগর
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ
বঙ্গদেশ
ভারতবর্ষ
গোয়া
কালিকট
পণ্ডিচেরী
কোচিন
সুমাত্রা
জাভা
জাঞ্জিবার
মাডাগাস্কার
উত্তমাশা অন্তরীপ
গিনি
পর্তুগাল
লিসবন
ফ্রান্স
ইংলণ্ড
কিউবা
মেক্সিকো
পানামা
ব্রা জি ল

অভিযানের ফলে জলপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা সম্ভব হয়। পৃথিবী যে সত্যই গোল, এবার তা সঠিকভাবে প্রমাণিত হয়।

তৃতীয়তঃ, ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে ইউরোপের বিভিন্ন জাতির মধ্যে বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। পরে বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে পর্তুগাল ও স্পেনের মধ্যে ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা যাতে ভবিষ্যতে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পরিণত না হয় তার জন্য পোপ আলেকজাণ্ডার একটি কাল্পনিক সীমারেখা টেনে দেন। পোপের সীমারেখা অনুযায়ী পশ্চিম দিকে আমেরিকা মহাদেশ গেল স্পেনের ভাগে। পূর্ব দিকে আফ্রিকা, চীন, জাপান, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ সমূহ পড়ল পর্তুগীজদের ভাগে। এইভাবে বিভিন্ন স্থানে তাদের উপনিবেশ গড়ে উঠল। প্রায় একশো বছর স্পেন ও পর্তুগাল নতুন দেশগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করে। ক্রমে ঔপনিবেশিক শোষণ শুরু হয়।

এই সময়ে কোর্টেস ও পিজারো নামে স্পেনের দু'জন নাবিক মেক্সিকো ও পেরু জয় করেন। স্পেনের অভিযাত্রীগণ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেও নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্পেন দক্ষিণ আমেরিকার স্বর্ণ ও রৌপ্য খনিগুলির মালিক হয়ে প্রভুত ধনশালী হয়ে উঠল। এই সব খনিতে তারা রেড ইণ্ডিয়ানদের মজুরের কাজ করতে বাধ্য করল।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে আরও তিনটি জাতি—ইংরাজ, ফরাসীও ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। ভারতবর্ষে পর্তুগীজদের আধিপত্য নষ্ট হয় এবং ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে দীর্ঘদিন বিবাদ চলে। ক্রমে ফরাসীদের পরাজিত করে ইংরাজগণ ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। আমেরিকায় স্পেনের সাম্রাজ্য নষ্ট হয়ে যায় এবং সেখানেও ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

চতুর্থতঃ, উপনিবেশগুলি থেকে প্রচুর সম্পদ ও অর্থ আহরণ করে ইউরোপের দেশগুলি খুব বিত্তবান হয়ে ওঠে। এই ঐশ্বর্যের দৌলতেই নতুন নতুন জাতি সমূহের সংগঠন ও উত্থান সম্ভব হয়েছিল।

কালক্রম	
বার্থেলোমিউ ডিয়াজের উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কার	১৪৮৮ খ্রীঃ
কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার	১৪৯২ খ্রীঃ
ভাস্কো-দা-গামার ভারত আগমন	১৪৯৮ খ্রীঃ
কেব্রালের ভারত আগমন	১৫০০ খ্রীঃ
ম্যাগেলান ও তাঁর সংগীদের ভূ-প্রদক্ষিণ	১৫১৯-১৫২২ খ্রীঃ

অনুশীলনী

নিবন্ধমূলক প্রশ্ন

১। কেন এবং কি ভাবে ইউরোপীয় নাবিকগণ নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারে অনুপ্রাণিত হন ?

২। পর্তুগীজ নাবিকদের নেতৃত্বে সামুদ্রিক অভিযান বর্ণনা কর।

৩। স্পেনীয় নাবিকদের প্রচেষ্টায় সামুদ্রিক অভিযানের সাফল্য বর্ণনা কর।

৪। ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলাফল বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। কোন্ কোন্ আবিষ্কৃত জিনিস সমুদ্রযাত্রায় নাবিকদের সাহায্য করেছিল ?

২। ভাস্কো-দা-গামার ভারতে আগমন সম্পর্কে কি জান ?

৩। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের কাহিনী সংক্ষেপে লেখ।

৪। টিকা লেখ ঃ—(ক) রাজপুত্র নাবিক হেনরী, (খ) আলবুকার্ক, (গ) আমেরিগো ভেসপুচি, (ঘ) ম্যাগেলান।

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। দু' এক কথায় উত্তর দাও ঃ—

(ক) 'অ্যাস্ট্রোলেব' কি ?

(খ) ভাস্কো-দা-গামা কত খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন ?

(গ) ভারতে পর্তুগীজ বাণিজ্য কুঠির গভর্ণর কে ছিলেন ?

(ঘ) কলম্বাস কত খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা আবিষ্কার করেন ?

(ঙ) কার নামানুসারে আমেরিকা মহাদেশের নামকরণ হয় ?

(চ) 'রেড ইণ্ডিয়ান' কাদের বলা হত ?

(ছ) আমেরিকার একটি প্রাচীন সভ্যতার নাম কর।

চতুর্থ অধ্যায়

॥ ইউরোপের সংস্কার আন্দোলন ॥

(ক) ভূমিকা ঃ নবজাগরণ আন্দোলনের ফলে ইউরোপের শিক্ষিত সম্প্রদায় পুরাতন প্রথা ও রীতিনীতির কঠোর সমালোচনা করতে শুরু করেন। হিব্রু ও গ্রীক ভাষা চর্চার ফলে তাঁরা বাইবেলের প্রকৃত তাৎপর্যের সঙ্গে পরিচিত হন এবং রোমান ক্যাথলিকদের নানা অনাচারের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এইসব অনাচার দূর করে ধর্মকে গ্লানিমুক্ত করার অভিপ্রায়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রবল জনমত গড়ে ওঠে। ফলে সমস্ত পশ্চিম ও উত্তর ইউরোপে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়।

ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতি ঃ ক্যাথলিক চার্চের যাজক শ্রেণীর মধ্যে নানা দুর্নীতি মধ্যযুগ থেকেই শুরু হয়েছিল। আধুনিক যুগের সূচনাতে যাজকদের সেইসব অনাচার আরও প্রকটভাবে দেখা দেয়। স্বয়ং পোপ ও ধর্মযাজকগণ ধর্মীয় আদর্শের কথা ভুলে গিয়ে ভোগবিলাসে মত্ত ও দুর্নীতিপূর্ণ কাজে লিপ্ত থাকতেন। অধিকাংশ ধর্মযাজকদের মধ্যেই প্রকৃত শিক্ষার বড় অভাব ছিল। পোপ অর্থের লোভে ধর্মযাজকদের পদ বিক্রয় করতেন। অনেক সময় এইসব পদে তাঁরা নিজেদের লোককে বসাতেন। ধর্মভীরু সাধারণ লোকের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁরা নানা অজুহাতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করতেন। এজন্য নানা ছল-চাতুরী গ্রহণ করতেও তাঁরা পশ্চাদপদ হতেন না। এই সময়ে পোপ প্রচার করেন যে, যদি কোন ব্যক্তি পাপ করে তাহলে পাপ থেকে তাকে মুক্তি দেবার সহজ এক উপায় তাঁর কাছে আছে। পাপী যদি পোপ কিংবা তাঁর প্রতিনিধিকে অর্থ দিয়ে **'মুক্তি পত্র'** ক্রয় করে তবে সে পাপ থেকে মুক্তি পাবে। এই মুক্তিপত্রকে বলা হত **'ইনডালজেন্স'**। এই মুক্তিপত্র বিক্রয়ের জন্য পোপ বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধি প্রেরণ করতেন। তাঁরা অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণের অন্ধ বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে মুক্তিপত্র বিক্রয়ের ব্যবসা চালাতেন। স্বল্পব্যয়ে পাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে যাওয়ার বাসনা কার না হয়। শুধু তাই নয়; ভূত-প্রেত ও ডাইনীর ভয় দেখিয়েও তাঁরা জনসাধারণের নিকট ক্রস চিহ্ন কবচ বিক্রয় করতেন। এইসব ভণ্ডামি ও অনাচারের ফলে রোমান ক্যাথলিক চার্চের অধঃপতন শুরু হয়।

ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ : পোপ ও ধর্মযাজকদের জীবনে ধর্মনিষ্ঠা ও আধ্যাত্মিক প্রভাবের কোন রকম পরিচয় না পেয়ে সাধারণ লোক তাঁদের উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছিল। ধর্মের নামে এইসব ভণ্ডামি ও অনাচার দেখে কয়েকজন ধার্মিক পণ্ডিতের মনে ভীষণ আঘাত লাগে এবং তারা চার্চকে দুর্নীতি মুক্ত করতে আন্দোলন শুরু করেন।

ধর্মসংস্কারকদের মধ্যে প্রথমেই জন ওয়াইক্লিফের নাম উল্লেখ করতে হয়। ওয়াইক্লিফ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংলণ্ডে আবির্ভূত হন। তিনি ছিলেন অক্সফোর্ডের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও দার্শনিক। তিনি ক্যাথলিক চার্চের এইসব দুর্নীতি ও অনাচারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ শুরু করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল—চার্চকে দুর্নীতি মুক্ত করতে হবে এবং যাজকগণ কেবল ধর্মকার্যে নিযুক্ত থাকবেন। জনসাধারণ যাতে বাইবেলের আসল তাৎপর্য বুঝতে পারে এই উদ্দেশ্যে তিনি বাইবেলের ইংরাজী অনুবাদ করেন। এই কাজে তাঁর ইংলণ্ডের বন্ধুরা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। তিনি ধর্মসংস্কার আন্দোলনের অগ্রদূত ছিলেন বলে তাঁকে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের "শুকতারা" বলা হয়।

বোহেমিয়ার প্রধান ধর্মসংস্কারক জন হাস ছিলেন ওয়াইক্লিফের পথ অনুসরণকারীদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ওয়াইক্লিফের মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। হাস এবং তাঁর সহযোগীরা চার্চের ধর্মযাজকদের নানা অনাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই অপরাধে তাঁকে পুড়িয়ে মারা হয় (১৪১৫ খ্রীঃ)।

ধর্মসংস্কারকদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তাঁর নাম মার্টিন লুথার। ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির এক কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। দর্শন ও ধর্মতত্ত্বে শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি মঠে প্রবেশ করেন। মঠে থাকাকালে তিনি খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের আচার-বিধি যথাযথভাবে মেনে চলতেন। কিছুকাল বাদে তিনি উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। এই পদে থাকাকালে তিনি একবার রোমে বেড়াতে গিয়ে ধর্মযাজকদের বিলাসিতা ও অনাচার দেখে অন্তরে খুব আঘাত পান। ধর্মের নামে অধর্ম তিনি সহ্য করতে

পারলেন না। নিজ কর্মস্থলে ফিরে এসে তিনি এর প্রতিকারের চিন্তা করতে থাকেন। এই সময়ে রোমের সেণ্ট পিটার্স গীর্জাটির সংস্কারকার্যের ব্যয় নির্বাহের জন্য টেট্‌জেল নামে একজন রোমান যাজক জার্মানিতে এসে জনসাধারণের নিকট মুক্তিপত্র বিক্রয় করতে থাকেন। লুথার মুক্তিপত্র বিক্রয়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করলেন। তিনি বললেন, অর্থ ব্যয় করে পাপমোচন করা যায় না; অনুতাপের ভিতর দিয়েই পাপ মোচন হয়। তাঁর মতে ধর্ম বিষয়ে সকলেই স্বাধীনতা থাকা উচিত। তিনি পোপের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। মুক্তিপত্র বিক্রয়ের বিরুদ্ধে একখানিপ্রতিবাদ-পত্র তিনি উইটেনবার্গ গীর্জার দরজায় টাঙিয়ে দেন। এতে অপমানিত হয়ে পোপ লুথারকে 'ধর্মদ্রোহী' বলে ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে লুথারের জনপ্রিয়তা বেশ বৃদ্ধি পায়। জার্মানির অনেক রাজাই তাঁর সমর্থক হলেন। লুথার প্রকাশ্য ভাবে পোপের নির্দেশ-পত্র আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন। ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে সম্রাট পঞ্চম চার্লস তাঁকে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করেও তাঁর মতবাদকে দমন করতে পারলেন না। একবার পঞ্চম চার্লস লুথারকে তাঁর মতবাদ ত্যাগ করতে নির্দেশ দেন। উত্তরে লুথার বলেছিলেন—বাইবেলের উপর ভিত্তি করে কেউ যদি যুক্তি দিয়ে তাঁর মত ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করতে পারে তবে তিনি অবশ্যই তাঁর মত ত্যাগ করবেন। পরে সম্রাটের বিরোধিতায় লুথার স্যাক্সনীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখানে থেকেই জার্মান ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেন। পরে উইটেনবার্গে ফিরে এসে তিনি ধর্মসংস্কার আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। এইভাবে লুথারের নেতৃত্বে জার্মানিতে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ইতিপূর্বে ইরাসমাস প্রমুখ পণ্ডিতেরা ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। এখন লুথারের যুক্তি ও বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে অনেকেই তাঁর মতবাদ গ্রহণ করতে লাগলেন।


মার্টিন লুথার

(খ) ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলাফল : ধর্মসংস্কারের ফলে মধ্যযুগের অখণ্ড খ্রীষ্টান জগৎ দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে গেল। প্রাচীন পন্থীরা রোমান ক্যাথলিক রয়ে গেলেন, আর নবীন পন্থীরা অর্থাৎ লুথারের মতবাদ সমর্থনকারীরা 'প্রোটেস্ট্যাণ্ট' নামে পরিচিত হলেন। লুথার ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ (protest) করেছিলেন বলে তাঁর অনুসৃত ধর্মমতকে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমত বলা হয়।

ধর্ম সংস্কারের ফলে জনসাধারণ খ্রীষ্টধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারে। এই সময়ে বাইবেল গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষা থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ করা হয়। এই অনুবাদ পাঠ করে ধর্ম সম্বন্ধে লোকের অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

ধর্মসংস্কার আন্দোলন জার্মানীতে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। স্বদেশ-প্রেমিক জার্মানরা এই আন্দোলনকে বিদেশী শক্তি পোপ-বিরোধী বলে গ্রহণ করল। নতুন ধর্মমতের সহজ ও সরল অনুশাসনগুলি জনসাধারণের আন্তরিক সমর্থন পেল। জার্মানির শাসক-সম্প্রদায় নতুন ধর্মমতের প্রভাবে খ্রীষ্টান মঠগুলির সম্পত্তি অধিগ্রহণ করে। কিন্তু উত্তর জার্মানিতে ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের প্রসার ঘটলেও দক্ষিণ জার্মানি পোপের অনুগত থেকে যায়। উত্তর জার্মানির সেক্সনী, ব্রাণ্ডেনবুর্গ, লুনবুর্গ প্রভৃতি রাজ্যের রাজারা লুথারের মতবাদ সমর্থন করে প্রটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডেও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের প্রসার ঘটে। ইংলণ্ডের টিউডর বংশের রাজা অষ্টম হেনরী প্রথমে পোপের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু পরে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক কারণে তিনি পোপের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। অষ্টম হেনরী তাঁর প্রথমা পত্নী ক্যাথারিনের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিয়ে অ্যান বোলান নামে এক সুন্দরী তরুণীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পোপ এতে অনুমতি না দেওয়ায় হেনরী পার্লামেণ্টের সাহায্যে আইন করে ইংলণ্ড থেকে পোপের প্রাধান্য লোপ করেন। তিনি পোপের নিষেধকে অগ্রাহ্য করে অ্যান বোলানকে বিয়ে করেন। এক বিশেষ আইনের বলে তিনি 'ইংলণ্ডের চার্চের প্রধান' হলেন। তিনি ইংলণ্ডের মঠগুলি ধ্বংস করে প্রচুর অর্থ লাভ করেন।

হেনরী পোপের ক্ষমতা হ্রাস করবার জন্যই এসব করেছিলেন। আসলে তিনি রোমের ক্যাথলিক পন্থী ছিলেন। তবে জনসাধারণের চাপে তাঁকে রোমান ক্যাথলিক চার্চের আচার-অনুষ্ঠানগুলির কিছু পরিবর্তন করতে হয়েছিল।


অষ্টম হেনরী

জার্মানি থেকে ধর্মসংস্কার আন্দোলন ক্রমে উত্তর ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। সুইজারল্যাণ্ডে ক্যালভিন ও জুইংলি নামে দুজন পণ্ডিত পোপের বিরোধিতা করেন। ক্যালভিনের কর্মস্থল ছিল জেনেভাতে। তিনি ছিলেন চরমপন্থী সংস্কারক। তিনি কঠোর সংযমের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতবাদ যাঁরা সমর্থন করতেন তাঁদের বলা হত 'পিউরিটান' বা 'পবিত্রতাবাদী'। সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, স্কটল্যাণ্ডে এবং ইংলণ্ডে তাঁর মতবাদ প্রচারিত হয়েছিল।

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রভাবে ইউরোপের খ্রীষ্টান জগতে যে বিরাট অনৈক্যের সৃষ্টি হল তার ফলে বহুকাল ধরে ইউরোপের প্রায় সবদেশেই ধর্মযুদ্ধ চলতে থাকে।

(গ) ক্যাথলিক চার্চের অভ্যন্তরীণ সংস্কার : ১। অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও সংহতি : ক্রমে ধর্মসংস্কার আন্দোলন ইউরোপের দেশগুলিতে বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই অবস্থা দেখে ক্যাথলিক পন্থী কিছু সৎ লোক নিজেদের দোষত্রুটি দূর করবার মন নিয়ে এগিয়ে আসেন। তাঁরা ক্যাথলিক চার্চের উন্নতি এবং যাজক সম্প্রদায়ের নৈতিক ও ধর্মীয় মান

উন্নয়নের ব্যাপারে নানাবিধ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাঁরা খোঁজ করে করে ধর্মীয় অনাচারগুলি এবং যাজক সম্প্রদায়ের দুর্নীতিগুলি দূর করতে বদ্ধপরিকর হন। ক্যাথলিক চার্চের আত্মশুদ্ধির আন্দোলন স্পেনেই প্রথম শুরু হয়েছিল। সেখান থেকে ইটালি ও অন্যান্য জায়গায় ছড়ায়।

ক্যাথলিক চার্চের অভ্যন্তরীণ সংস্কারের ক্ষেত্রে জেসুইট সম্প্রদায়ের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের ইগনেসিয়াস লয়লা কর্তৃক এই নতুন সম্প্রদায়টি গঠিত হয়। রোমান চার্চকে নতুন ভাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জেসুইট সম্প্রদায় কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলতেন। তাঁরা নতুন উদ্যম নিয়ে চার্চের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেন। ইগনেসিয়াস ও জেভিয়ার প্রভৃতি জেসুইটদের চেষ্টায় ধীরে ধীরে ক্যাথলিক চার্চের শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং রোমান ক্যাথলিক ধর্ম বিভিন্ন দেশে প্রচারিত হয়। জেসুইটদের আর একটি প্রধান কাজ ছিল শিক্ষা বিস্তার।

প্রতি-সংস্কার আন্দোলনে 'ইনকুইজিসন কোর্ট' বা যাজকদের বিচারালয়ের ভূমিকাও ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। স্পেনের ধর্মদ্রোহীদের বিচারের জন্য এই বিচারালয় স্থাপিত হয়েছিল। এই সকল বিচারালয়গুলি ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে বহু মানুষকে শাস্তি দিয়েছিল।

রোমান ক্যাথলিক চার্চকে পুনরায় শক্তিশালী করে তুলতে 'কাউন্সিল অফ্ ট্রেন্ট' নামক একটি সভার ভূমিকাও ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। ১৫৪৫ খ্রীঃ সম্রাট পঞ্চম চার্লস ট্রেন্ট নামক স্থানে এক ধর্মসভা আহ্বান করেন। এই সভার অধিবেশন প্রায় ১৮ বছর ধরে চলেছিল। এই সভা চার্চের বহু নিয়মাবলীর সংস্কার সাধন করে এবং নতুন নতুন নিয়ম প্রবর্তন করে। এই-ভাবে শীঘ্রই রোমান ক্যাথলিক চার্চের মূল মতবাদ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

২। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে ধর্মযুদ্ধ : পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন স্পেনের পঞ্চম চার্লস। তিনি ক্যাথলিক চার্চের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জার্মানি ছিল তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। যখন এই জার্মানিতে লুথারের প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমত প্রসার লাভ করল তখন স্বভাবতই তিনি খুব বিচলিত হলেন এবং যে কোন উপায়ে

প্রোটেস্ট্যাণ্ট মতবাদ দমন করতে চাইলেন। পঞ্চম চার্লস প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম দমন করবার চেষ্টা করলে তাঁরই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রোটেস্ট্যাণ্ট রাজ্যগুলি নিজেদের মধ্যে একটি সংঘ বা লীগ স্থাপন করে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। পঞ্চম চার্লসের প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম বিরোধী মনোভাবের জন্য শেষ পর্যন্ত ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রোটেস্ট্যাণ্ট সংঘের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বাধল। এই যুদ্ধ প্রায় ন' বছর ধরে চলেছিল। যুদ্ধের প্রথম দিকে চার্লস জয়লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে সন্ধি করতে হয়। এই সন্ধি হয়েছিল ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে অগসবার্গ নামক স্থানে। ইহা 'অগসবার্গের সন্ধি' নামে পরিচিত। এই সন্ধিতে স্থির হয় যে, কোন্ রাজ্যে কোন্ ধর্মমত প্রবর্তন করা হবে সেটা নির্ধারণ করবেন সেই রাজ্যের রাজা। এইভাবে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে লুথার পন্থীরা নিজেদের ধর্মমত গ্রহণ করবার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করল।

(ঘ) নেদারল্যাণ্ডে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মের উচ্ছেদ ঘটাতে স্পেনের সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের প্রচেষ্টা : পঞ্চম চার্লস স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করলে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় ফিলিপ স্পেন, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের সিংহাসনে বসেন। হল্যাণ্ড ছিল নেদারল্যাণ্ডের একটি অংশ। এই নেদারল্যাণ্ডের প্রজারা অর্থাৎ ওলন্দাজগণ প্রোটেস্ট্যাণ্ট মতবাদ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ইউরোপের অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের মত এই নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক। তিনি যখন দেখলেন, তাঁর হল্যাণ্ডের প্রজাবৃন্দ মার্টিন লুথারের ধর্মমত গ্রহণ করছে তখন তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হন। তিনি তাদের সমুচিত শিক্ষা দিবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন। তিনি হল্যাণ্ড থেকে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মের ধ্বংস সাধনে মেতে উঠলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ডিউক আলভা নামক এক অত্যাচারী ব্যক্তিকে সেখানকার প্রধান শাসনকর্তা করে পাঠালেন।

প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মাবলম্বী ওলন্দাজদের উপর শুরু হল আলভার অমানুষিক অত্যাচার। প্রজাদের জব্দ করার জন্য তিনি তাদের উপর উচ্চ হারে কর ধার্য করলেন। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, বণিকদেরও

এই কর প্রদানে খুব কষ্ট হল। কর প্রদানে অক্ষম ব্যক্তিদের উপর তিনি অবাধে হত্যা, লুণ্ঠন ও নির্যাতন চালাতে লাগলেন। স্পেন সরকারের অত্যাচার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ওলন্দাজদের প্রতিরোধ ক্ষমতা ও মনোবল বেড়ে গেল। তারা স্পেনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

প্রিন্স উইলিয়মের নেতৃত্বে ওলন্দাজ বিদ্রোহ : এই সংকট মুহূর্তে হল্যাণ্ডে উইলিয়ম অফ অরেঞ্জ বা উইলিয়ম দি সাইলেন্ট নামে একজন বীর দেশনেতার আবির্ভাব ঘটে। তাঁর নেতৃত্বে শুরু হয় হল্যাণ্ডবাসীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম। একদিকে পরাক্রমশালী স্পেনের রাজশক্তি, অন্য দিকে হল্যাণ্ডের নিরস্ত্র অধিবাসী। হল্যাণ্ডবাসীদের দমন করতে গিয়ে ডিউক আলভা নগরের পর নগর জ্বালিয়ে দিয়েছেন এবং দেশ নেতাদের তিনি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। হল্যাণ্ডবাসীরা তথাপি বিচলিত হয়নি। প্রিন্স উইলিয়মের সুযোগ্য নেতৃত্বে তারা দারুণ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। আলভার শিক্ষিত সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে হার্লেম, আস্কমার, লেডেন প্রভৃতি শহরের কত নরনারী প্রাণ দিয়েছেন তার সীমা সংখ্যা নেই। আলভা অত্যাচারের মাত্রা যতই বাড়াতে লাগল হল্যাণ্ডের বিদ্রোহীরা ততই মরিয়া হয়ে সংগ্রাম করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত উইলিয়ামকে পরাজিত করতে না পেরে দ্বিতীয় ফিলিপ এক আততায়ীকে দিয়ে তাঁকে হত্যা করান।

ফলাফল : হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা লাভ : হল্যাণ্ডকে কিছুতেই দমাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত স্পেন বাধ্য হয়েই হল্যাণ্ডের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেয়। ওলন্দাজগণ তখন হল্যাণ্ডে এক সাধারণতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠা করে। হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রাম দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল। ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে তারা প্রকৃতভাবে স্বাধীন হয়, কিন্তু ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে 'ওয়েস্টফ্যালিয়ার সন্ধিতে' তা আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত পায়। কিছুকালের মধ্যেই হল্যাণ্ড এক আত্মবিশ্বাসী দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং অন্যান্য প্রান্তে তারা এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলল।

দক্ষিণ নেদারল্যাণ্ড : এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে হল্যাণ্ডের বা উত্তর নেদারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামে দক্ষিণ নেদারল্যাণ্ডের অধিবাসীদের

কোন সমর্থন ছিল না। কারণ তারা ছিল রোমান ক্যাথলিক। স্পেনের সরকার নানা ভাবে প্রলোভন দেখিয়ে তাদের বশীভূত করে রেখেছিল। সংকীর্ণ স্বার্থের মোহে তারা বিদেশী শক্তির পক্ষ সমর্থন করেছিল। এই দক্ষিণ নেদারল্যান্ডেরই (পরবর্তীকালে অষ্ট্রিয়ান নেদারল্যান্ড নামে পরিচিত) নাম হল বেলজিয়াম সাম্রাজ্য।

(ঙ) **প্রোটেস্ট্যান্ট ইংলন্ড ও সেখানকার চার্চকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আনার জন্য ফিলিপের প্রয়াস :** এলিজাবেথ যখন ইংলণ্ডের রাণী (১৫৫৮-১৬০৩ খ্রীঃ) তখন স্পেনের রাজা ছিলেন দ্বিতীয় ফিলিপ। দ্বিতীয় ফিলিপ খুব শক্তিমান ও গর্বিত ছিলেন। নানা কারণে এই সময় ইংলণ্ডের সঙ্গে স্পেনের বিরোধ বাধে।

দ্বিতীয় ফিলিপ এলিজাবেথকে বিয়ে করে করে নিজের প্রাধান্য বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাণী এলিজাবেথ তাঁকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেন এবং সারা জীবন অবিবাহিতা থাকেন। এতে ফিলিপের মর্যাদায় আঘাত লাগে।

এই সময়ে স্কটল্যাণ্ডের রাণী ছিলেন মেরী স্টুয়ার্ট। তিনি ছিলেন ক্যাথলিক পন্থী। একবার ধর্মীয় কারণে স্কটল্যাণ্ডে গোলযোগ দেখা দিলে মেরী ইংলণ্ডে গিয়ে এলিজাবেথের আশ্রয় লাভ করেন। সেখানে সামান্য অপরাধে এলিজাবেথ স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরীর প্রাণদণ্ড দেন।


এলিজাবেথ

এছাড়া নেদারল্যাণ্ডের বিদ্রোহে এলিজাবেথ গোপনে বিদ্রোহীদের নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন।

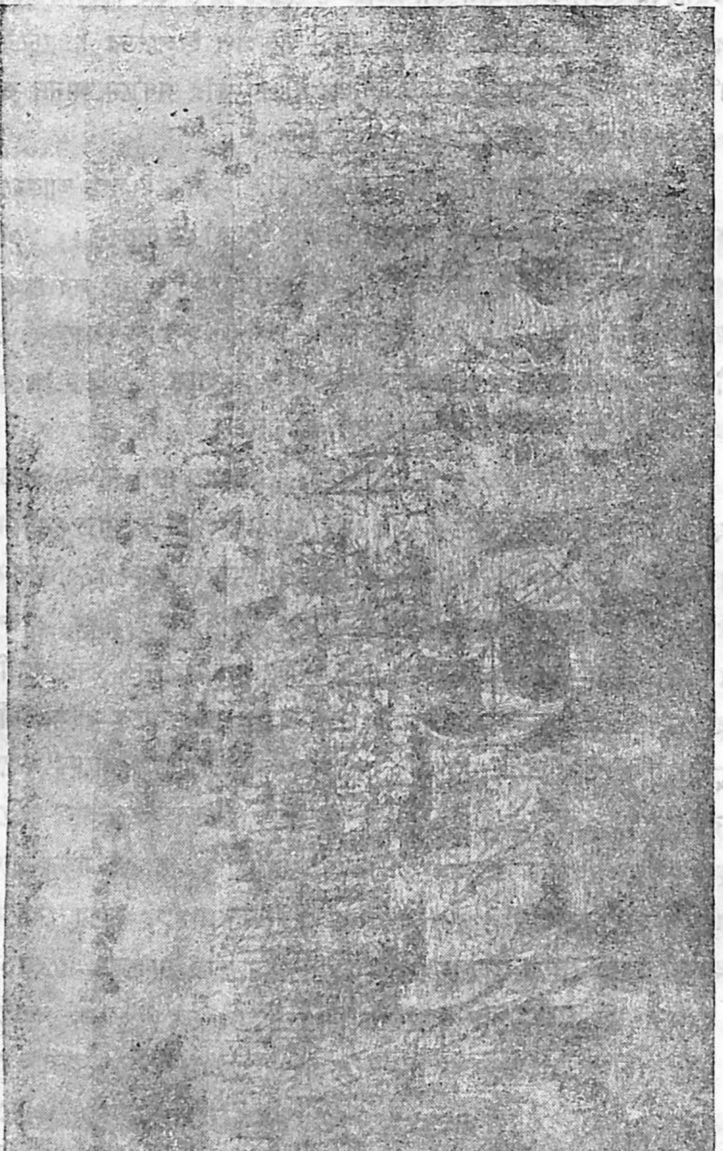
এইসব কারণে দ্বিতীয় ফিলিপ ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হন। তিনি এলিজাবেথকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন। এই সময়ে

ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকই ছিল প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মাবলম্বী। রাণী এলিজাবেথ ইংলণ্ডে রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট এই দুই মতবাদের মাঝামাঝি জাতীয় চার্চ গঠন করেছিলেন। ফিলিপ ইংলণ্ডের প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম ও সেখানকার জাতীয় চার্চের বিনাশ ঘটিয়ে তাঁর অধীনে আনার জন্য বদ্ধ পরিকর হলেন।

স্প্যানিশ আর্মাডা : এই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় ফিলিপ ইংলণ্ড আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করেন। তিনি অসংখ্য জাহাজ তৈরী করালেন। ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে নৌ-সেনাপতি মেডিনা সিডোনিয়ার নেতৃত্বে এই সব জাহাজ হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে ইংলণ্ডের দিকে রওনা হল। স্পেনের এই নৌ-বাহিনী ইতিহাসে 'স্প্যানিশ আর্মাডা' নামে খ্যাত। একে 'অজেয় আর্মাডা'ও (ইনভিন্সিবল আর্মাডা) বলা হত।

ইংলণ্ডও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। ফ্রান্সিস ড্রেক নামক একজন বিখ্যাত নাবিক ইংরেজ নৌ-সৈন্যদের সেনাপতি ছিলেন। বিখ্যাত স্প্যানিশ আর্মাডার ধ্বংস সাধনে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। স্পেনের জাহাজ ইংলণ্ডের উপকূলে উপস্থিত হলে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইংরেজদের জাহাজগুলি ছিল ছোট ছোট, আর স্পেনের জাহাজগুলি ছিল বড় বড়। ইংরেজদের জাহাজগুলি স্পেনের জাহাজের দিকে সহসা গুলি ছুঁড়েই দ্রুত বেগে পালিয়ে যেত। স্পেনের বড় বড় জাহাজ তাদের ধরতে পারত না। এই ভাবে কিছুদিন যুদ্ধের পর স্পেনের জাহাজ ক্যালে শহরে পৌঁছে গেল। এই সময়ে ইংরাজ সৈন্যদের মাথায় এক নতুন বুদ্ধি উপস্থিত হল। তারা নিজেদের কয়েকটি জাহাজে আগুন ধরিয়ে স্পেনের জাহাজের দিকে ছেড়ে দিল। স্পেনের নৌ-সেনাপতি ভাবলেন ইংরেজদের ঐ আগুন-ধরা জাহাজ যদি তাদের জাহাজের মাঝে ঢুকে পড়ে, তাহলে তাদের জাহাজগুলিতেও আগুন ধরে যাবে। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ সব জাহাজকে নোঙর তুলে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেবার নির্দেশ দেন। এদিকে স্পেনের জাহাজগুলি ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লে ইংরেজদের দ্রুতগামী জাহাজগুলি তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এক এক করে ডুবিয়ে দিতে থাকে। তাছাড়া ফেরার সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগেও স্পেনের অনেক জাহাজ নষ্ট হয়ে

যায়। এইভাবে বিখ্যাত স্প্যানিশ আর্মাডা ধ্বংস হয়। কয়েকশ জাহাজের



স্প্যানিশ আর্মাডা

মধ্যে মাত্র কয়েকখানা জাহাজ স্পেনে ফিরে যেতে পেরেছিল। স্পেন সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের গর্বিত অভিযান শোচনীয় ব্যর্থতায় পরিণত হল।

কালক্রম	
জন ওয়াইক্লিফ	১৩২৪-১৩৮৪ খ্রীঃ
মার্টিন লুথার	১৪৮৩-১৫৪৬ খ্রীঃ
ইংলণ্ডে অষ্টম হেনরীর রাজত্বকাল	১৫০৯-১৫৪৭ খ্রীঃ
স্পেনের পঞ্চম চার্লসের রাজত্বকাল	১৫১৯-১৫৫৬ খ্রীঃ
স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপের রাজত্বকাল	১৫৫৬-১৫৯৮ খ্রীঃ
ইংলণ্ডে এলিজাবেথের রাজত্বকাল	১৫৫৮-১৬০৩ খ্রীঃ
অগসবার্গের সন্ধি	১৫৫৫ খ্রীঃ
ওয়েস্টফ্যালিয়ার চুক্তি	১৬৪৮ খ্রীঃ

অনুশীলনী

নিবন্ধমূলক প্রশ্ন

১। ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতি-সমূহ উল্লেখ কর।
২। মার্টিন লুথারের ধর্মসংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।
৩। ইউরোপে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলাফল কি হয়েছিল ?
৪। ক্যাথলিক চার্চের আভ্যন্তরীণ সংস্কারগুলি উল্লেখ কর।
৫। পবিত্র রোম সাম্রাজ্যে ধর্মযুদ্ধের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৬। নেদারল্যান্ডের প্রোটেস্ট্যান্টদের ধ্বংস সাধনে দ্বিতীয় ফিলিপের ভূমিকা বর্ণনা কর।
৭। 'স্প্যানিশ আর্মাডা' কি ? স্প্যানিশ আর্মাডা কিভাবে ধ্বংস হয়েছিল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। 'মুক্তি পত্র' বলতে কি বোঝ ?
২। ধর্মসংস্কারক হিসাবে জন ওয়াইক্লিফ ও জন হাসের অবদান উল্লেখ কর।
৩। জার্মানির কোন্ কোন্ রাজ্য লুথারের সমর্থক ছিল ?
৪। 'উইলিয়ম দি সাইলেণ্ট' কে ছিলেন ? ওলন্দাজদের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান উল্লেখ কর।
৫। রাণী এলিজাবেথের সঙ্গে দ্বিতীয় ফিলিপের বিরোধের কারণ কি ?
৬। টীকা লিখ ঃ—অগসবার্গের সন্ধি, ওয়েস্টফ্যালিয়ার চুক্তি।

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। দু' এক কথায় উত্তর দাও ঃ—
(ক) ধর্মসংস্কারকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কে ছিলেন ?
(খ) সুইজারল্যান্ডের একজন পিউরিটান নেতার নাম কর।
(গ) জেসুইট সম্প্রদায় কবে গঠিত হয় ? কে গঠন করেন ?
(ঘ) অগসবার্গের সন্ধি কবে স্বাক্ষরিত হয়েছিল ?
(ঙ) ইংলণ্ডের সঙ্গে স্পেনের যুদ্ধে ইংলণ্ডের নৌ-সেনাপতি কে ছিলেন ?
(চ) কোন্ সন্ধিতে হল্যান্ডের স্বাধীনতা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে ?

পঞ্চম অধ্যায়

॥ সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের বিপ্লব ॥

ভূমিকা : টিউডর যুগে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি দেখা যায়। নবজাগরণের প্রভাবে ইংলণ্ডে নতুন চিন্তাধারার সূত্রপাত হয়। ইংলণ্ডে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে পোপের প্রভাব নষ্ট হয়। টিউডর বংশের রাজা ও রাণীদের মধ্যে সপ্তম হেনরী, অষ্টম হেনরী এবং এলিজাবেথ ছিলেন বিখ্যাত। তাঁরা অপ্রতিহতভাবে রাজত্ব করতেন এবং তাঁদের প্রখর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ছিল। তাঁরা দেশে শান্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন এবং বণিক শ্রেণীকে উৎসাহ দিয়ে দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেন। এই সময়ে দেশে নানা পরিবর্তনের ফলে ছোট ছোট জমিদার, বণিক ও ব্যবসায়ী প্রভৃতি মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকেরা সমাজে বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে এবং তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি পায়।

রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে বিবাদের মূল কারণ : টিউডর রাজগণের একটি মস্ত বড় গুণ ছিল যে তাঁরা প্রজাদের অপ্রীতিকর কোন কাজ করতেন না। তাই স্বেচ্ছাচারী হলেও তাঁরা ছিলেন জনপ্রিয়। কিন্তু স্টুয়ার্ট রাজারা টিউডর রাজগণের মত সহানুভূতিশীল ছিলেন না। এলিজাবেথের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই টিউডর যুগের অবসান ঘটে। তাঁর নিকটতম আত্মীয় স্কটল্যাণ্ডের স্টুয়ার্ট বংশীয় রাজা ষষ্ঠ জেমস্ ইংলণ্ডের রাজা হয়ে 'প্রথম জেমস্' নামে পরিচিত হন। প্রজাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁর কোন সহানুভূতি ছিল না। প্রথম জেমস্ বিশ্বাস করতেন যে তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি। ঈশ্বরই তাঁকে সাধারণ মানুষের উপর রাজত্ব করতে পাঠিয়েছেন। সুতরাং তাঁর কাজের সমালোচনা করার অর্থই হল ঈশ্বরকে অমান্য করা। তাই কোন প্রজারই তাঁর কাজের সমালোচনা



প্রথম জেমস্

করার অধিকার নেই। কিন্তু যুক্তিবাদী প্রজারা রাজার এই দাবী মেনে নিতে রাজী হোল না। ফলে রাজায় প্রজায় বিরোধ দেখা দিল। প্রজাদের অসন্তোষ তাঁদের পার্লামেণ্টের বিভিন্ন অধিবেশনে প্রকাশ হতে লাগল।

এই সময়েইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন পিউরিটান অর্থাৎ চরমপন্থী প্রোটেস্ট্যাণ্ট। এদিকে প্রথম জেমস পিউরিটান মতবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাই ধর্মবিষয়ে পিউরিটানদের প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাব পার্লামেণ্টের সহিত রাজার সম্পর্ককে আরও তিক্ত করে তুলল।

জেমসের পুত্র প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে পার্লামেণ্টের সঙ্গে রাজার বিরোধ চরমে উঠল। চার্লস পিতার ন্যায় নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে মনে করতেন। তিনি স্বৈরাচারী শাসন শুরু করলেন। পার্লামেণ্ট না ডেকেই তিনি দেশ শাসন করতে লাগলেন। পার্লামেণ্টের সদস্যগণ মনে করলেন, রাজা পার্লামেণ্টকে অগ্রাহ্য করে তাঁদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করছেন। ফলে রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে বিরোধ অনিবার্য হয়ে উঠল।



প্রথম চার্লস

গৃহযুদ্ধ: প্রথম চার্লসের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে ১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টের সদস্যগণ একটি আবেদন পত্রে কতকগুলি অধিকার দাবী করল। একে বলা হয় 'অধিকারের আবেদন' (পিটিশন অফ রাইটস)। এই আবেদন পত্রে উল্লেখ করা ছিল যে পার্লামেণ্টের সম্মতি ব্যতীত কোন কর ধার্য করা যাবে না, বিনা বিচারে কাউকে আটক করা চলবে না এবং পার্লামেণ্টের অনুমতি ব্যতীত কোন কর আদায় করা চলবে না। চার্লস অধিকারের আবেদন মেনে নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু দীর্ঘ এগার বছর তিনি পার্লামেণ্ট আহ্বান করেন নি। এই সময়ে তিনি নানা রকম বে-আইনী উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। পরে অবশ্য নিদারুণ অর্থ-সংকটে পড়ে চার্লসকে পুনরায় পার্লামেণ্ট আহ্বান করতে হয়েছিল। এই পার্লামেণ্ট দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে চলেছিল বলে একে 'দীর্ঘ পার্লামেণ্ট'

(লং পার্লামেন্ট) বলা হয়। এই সময়ে পার্লামেণ্টের সদস্যগণ রাজাকে কোন অর্থ মঞ্জুর করেননি। বরং তাঁরা রাজার অত্যাচার ও বেআইনী কাজের তীব্র সমালোচনা করেন। চার্লস তখন পিম্, হ্যাম্পডেন প্রমুখ নেতাদের গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরা আগেই পালিয়ে গিয়েছিলেন। এইবার রাজার বিরুদ্ধে পার্লামেণ্ট প্রকাশ্য ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইংলণ্ডের ইতিহাসে একে 'গৃহযুদ্ধ' বলা হয়। এই গৃহ যুদ্ধ প্রায় সাত বছর ধরে (১৬৪২-১৬৪৯) চলেছিল। প্রথম দিকে রাজারই জয় হতে থাকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটে।

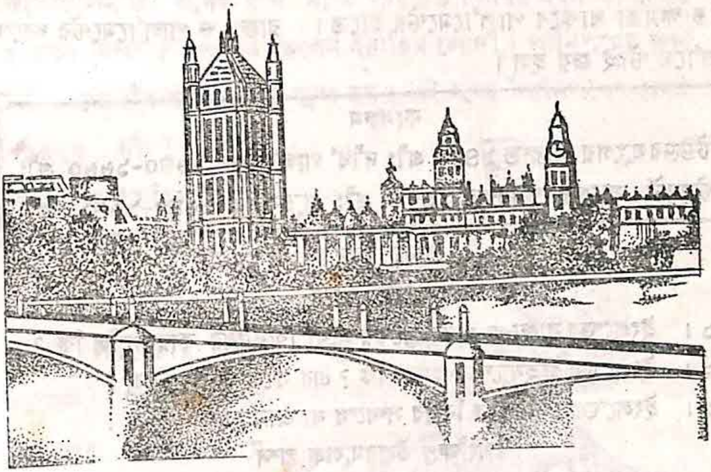
ক্রমওয়েল ও কমনওয়েল্‌থ : এই সময়ে পার্লামেণ্টের পক্ষে একজন বীর যোদ্ধার আবির্ভাব হয়। তাঁর নাম **অলিভার ক্রমওয়েল**। পূর্ব-ইংলণ্ডের এক গ্রাম্য জমিদারের গৃহে তাঁর জন্ম হয়েছিল। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ধর্মের প্রতি তাঁর তীব্র অনুরাগ ছিল। তাঁর সামরিক প্রতিভাও ছিল অসাধারণ। তাঁর সৃষ্ট অশ্বারোহী বাহিনী 'লৌহ পার্শ্ব' নামে খ্যাত ছিল। এই সৈন্য বাহিনীর সাহায্যে তিনি রাজাকে পরাজিত করেন। রাজা চার্লস বন্দী হন। চার্লসের বিচারের জন্য পার্লামেণ্ট একটি উচ্চ আদালত গঠন করে। বিচারে চার্লসকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী তাঁর শিরচ্ছেদ করা হল।


অলিভার ক্রমওয়েল

চার্লসের মৃত্যুর পর রাজপদ তুলে দিয়ে সাধারণতন্ত্রের (কমনওয়েলথ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু আসলে ক্রমওয়েল দেশের সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিলেন। তিনিও পার্লামেণ্টকে বিশেষ মানতেন না, সেনাপতিদের সাহায্যে দেশ শাসন করতেন। পিউরিটান ছিলেন বলে আমোদ-প্রমোদও তিনি অপছন্দ করতেন।

স্টুয়ার্ট বংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা : ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর দেশে আবার অশান্তি দেখা দিল। তাঁর পুত্র রিচার্ড ক্রমওয়েল দেশে বিশৃঙ্খলা দমন করে শান্তি স্থাপন করতে পারলেন না। ফলে প্রজাতন্ত্র ভেঙে পড়ল। তখন জনসাধারণ প্রথম চার্লসের নির্বাসিত পুত্র দ্বিতীয় চার্লসকে সিংহাসনে আরোহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাল। দ্বিতীয় চার্লস ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করলে ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়। দ্বিতীয় চার্লস বুদ্ধিমান ছিলেন। পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা ভেবে তিনি পার্লামেণ্টের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলেছিলেন।

গৌরবময় বিপ্লব (১৬৮৮ খ্রীঃ) : দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা দ্বিতীয় জেমস্ ইংলণ্ডের রাজা হন। তিনি ছিলেন উদ্ধত প্রকৃতির লোক। তাঁর সঙ্গে পার্লামেণ্টের আবার বিরোধ বাধে।



পার্লামেণ্ট

দ্বিতীয় জেমস্ ছিলেন রোমান ক্যাথলিক। তিনি ক্যাথলিদের বিশেষ বিশেষ সুবিধা দিতে লাগলেন। সেনাদলে, রাজকার্যে তিনি ক্যাথলিকদের নিয়োগ করতে লাগলেন। তাই দেখে ইংলণ্ডের অধিবাসীদের মনে আশংকা হল যে তিনি ইংলণ্ডে পুনরায় ক্যাথলিক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবেন। এতদিন জেমসের কোন পুত্র ছিল না। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তাঁর এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করায় সকলের মনেই ভয়ের সঞ্চার হল। সকলে ভাবল—জেমসের পরেও দেশে ক্যাথলিক রাজত্ব চলতে থাকবে। তখন ইংলণ্ডের সমস্ত দল একত্রিত হয়ে জেমসের জামাতা হল্যাণ্ডের অরেঞ্জ বংশের উইলিয়মকে ইংলণ্ডের শাসনভার গ্রহণ করতে আহ্বান করে। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম

সসৈন্যে ইংলণ্ডে এসে উপস্থিত হন। কিন্তু জেমস্ তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা না করে ফ্রান্সে পলায়ন করেন। বিনা রক্তপাতে এই বিপ্লব সংঘটিত হয় বলে একে 'গৌরবময় বিপ্লব' বা 'রক্তপাতহীন বিপ্লব' বলা হয়।

অধিকার সংক্রান্ত আইন (১৬৮৯ খ্রীঃ) এবং অন্যান্য ফলাফল ঃ উইলিয়মের রাজত্বের শুরুতেই 'অধিকার সংক্রান্ত আইন' (বিল অফ্ রাইটস্) নামে একটি বিধি পার্লামেণ্টে গৃহীত হয়। এর দ্বারা রাজা ও প্রজার অধিকার নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। রাজা পার্লামেণ্টের অনুমতি ছাড়া কোন অর্থ আদায় করতে পারবেন না। পার্লামেণ্টের সদস্যরা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারবেন। ফলে রাজা ও প্রজার মধ্যে দীর্ঘদিনের বিরোধের অবসান ঘটে। এখন থেকে ইংলণ্ডে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। রাজারা রাজত্ব করবেন, কিন্তু শাসন পরিচালনার প্রকৃত ক্ষমতা থাকবে পার্লামেণ্টের হাতে। রাজা ও পার্লামেণ্টের দ্বন্দ্বে পার্লামেণ্টেরই জয় হল।

কালক্রম

টিউডর যুগের আরম্ভ ১৪৮৫ খ্রীঃ	দীর্ঘ পার্লামেণ্ট ১৬৪০-১৬৬০ খ্রীঃ
স্টুয়ার্ট যুগের আরম্ভ ১৬০৩ খ্রীঃ	গৃহযুদ্ধ ১৬৪২-১৬৪৯ খ্রীঃ

অনুশীলনী

নিবন্ধমূলক প্রশ্ন

১। ইংলণ্ডের রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে বিরোধের কারণগুলি কি ?

২। ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধের কারণ কি ? এর ফলে কি হয়েছিল ?

৩। ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব সম্বন্ধে যা জান লেখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। টিউডর বংশের কয়েকজন শাসকের নাম লিখ। তাঁরা কেমন ছিলেন ?

২। শাসন ব্যবস্থায় প্রথম জেমসের নীতি কি ছিল ?

৩। ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে ইংলণ্ডের শাসন ব্যবস্থা কিরূপ ছিল ?

৪। টীকা লেখ ঃ—পিটিশন অফ রাইটস্, বিল অফ রাইটস্।

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। দু-এক কথায় উত্তর দাও ঃ—

(ক) স্টুয়ার্ট বংশের প্রথম রাজা কে ছিলেন ?

(খ) ইংলণ্ডে কাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ হয়েছিল ?

(গ) দীর্ঘ পার্লামেণ্ট কত বছর স্থায়ী হয়েছিল ?

(ঘ) ক্রমওয়েল কে ছিলেন ?

(ঙ) কত খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব সংঘটিত হয় ?

ষষ্ঠ অধ্যায়

॥ ভারতবর্ষ ॥

(ক) মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার (১৫২৬-১৭০৭ খ্রীঃ)

'মোঙ্গল' শব্দ থেকে 'মুঘল' কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। মোঙ্গল জাতি মধ্য এশিয়ার অধিবাসী ছিল। মোঙ্গলেরা বহুবার ভারতে অভিযান চালালেও ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন চেঙ্গিস খাঁ ও তৈমুরলঙ্-এর বংশধর বাবর।

বাবর (১৫২৬-১৫৩০ খ্রীঃ) : বাবর দিল্লীর সিংহাসনে যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা 'মুঘল বংশ' নামে পরিচিত। বাবর যখন কাবুলের অধিপতি তখন দিল্লীর সুলতান ছিলেন ইব্রাহিম লোদী। পানিপথের রণ-ক্ষেত্রে ইব্রাহিম লোদীর সহিত তাঁর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ 'পানিপথের প্রথম যুদ্ধ' (১৫২৬ খ্রীঃ) নামে পরিচিত। যুদ্ধে ইব্রাহিম নিহত হলে বাবর দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন। এইভাবে তিনি ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করলেন। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তার করতে গিয়ে বাবরকে আরও একটি বিরাট শক্তির সম্মুখীন হতে হয়। এই বিরাট শক্তি হল ভারতের স্বাধীনচেতা বীর রাজপুত জাতি। মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহ ছিলেন এই বীর রাজপুত জাতির নেতা। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে ফতেপুর সিক্রীর নিকট 'খানুয়া' নামক স্থানে তিনি বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এই যুদ্ধেও বাবর জয়লাভ করেন এবং মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।



বাবর

হুমায়ুন (১৫৩০-৪০খ্রীঃ এবং ১৫৫৫-৫৬খ্রীঃ) ঃ বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। হুমায়ুনের সময় আফগানগণ মুঘলদের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করছিল। বিহারের আফগান নেতা শের খাঁর শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে দেখে হুমায়ুন শের খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু শের খাঁর সংগে যুদ্ধে প্রথমে তিনি সাফল্য অর্জন করলেও পরে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হয়ে পারস্যে পলায়ন করতে বাধ্য হন। শেরশাহের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরদের দুর্বলতার সুযোগে হুমায়ুন আবার দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেছিলেন।



হুমায়ুন

শেরশাহ (১৫৪০-৪৫খ্রীঃ): শেরশাহ বিহারের সাসারাম প্রদেশের এক জায়গীরদারের পুত্র। তাঁর বাল্যজীবন মোটেই সুখের ছিল না। নিজের ক্ষমতা ও দক্ষতায় শেষ পর্যন্ত তিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন।

শেরশাহ মাত্র পাঁচ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তিনি ছিলেন সুশাসক। প্রজাদের সুখ-সুবিধার দিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। তিনি রাজ্যের সমস্ত জমি জরিপ করিয়ে প্রজাদের স্বত্ব নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। তাঁর আমলে রাস্তাঘাটের সংস্কার হয়। বিখ্যাত 'গ্রাণ্ড ট্রাংক রোডটি' তাঁরই তৈরী।



শেরশাহ

দ্রুত সংবাদ প্রেরণের জন্য তিনি ঘোড়ার সাহায্যে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করেন এবং সুবিচারের জন্য আদালত স্থাপন করেন। ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ কালে বারুদের আগুনে তাঁর মৃত্যু হয়।

আকবর (১৫৫৬-১৬০৫খ্রীঃ): আকবর ছিলেন হুমায়ুনের পুত্র। হুমায়ুনের মৃত্যু হলে আকবরের অনুপস্থিতিতে মহম্মদ আদিল শাহের হিন্দু মন্ত্রী হিমু দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করে নিলেন। ফলে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের প্রান্তরে হিমুর সংগে আকবর ও তাঁর অভিভাবক বৈরাম খাঁর যুদ্ধ হল। এই যুদ্ধ ইতিহাসে 'দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ' নামে খ্যাত। মুঘলেরা এই যুদ্ধে জয়ী হয়। পানিপথের যুদ্ধের পর বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বের সময় গোয়ালিয়র, জৌনপুর, আজমীর প্রভৃতি রাজ্য অধিকৃত হয়েছিল।



আকবর

এইবার আকবর উত্তর ভারতের অন্যত্র রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হলেন। ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে গণ্ডোয়ানা রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হল। ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আকবর মেবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ করলেন। চিতোর রক্ষার জন্য রাজপুতগণ বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হলেন। কিন্তু মেবারের বীরগণ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন নি। উদয়সিংহের মৃত্যু হলে



রাণাপ্রতাপ

তাঁর বীর পুত্র রাণাপ্রতাপ মুঘলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন।

হলদিঘাট নামক স্থানে উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হল (১৫৭৬ খ্রীঃ)। প্রতাপ অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে পরাজিত হলেন। আকবর যুদ্ধ চালিয়ে বাংলাদেশ (১৫৭৬ খ্রীঃ), কাবুল (১৫৮১ খ্রীঃ), কাশ্মীর (১৫৮৬ খ্রীঃ), সিন্ধু (১৫৯১ খ্রীঃ), উড়িষ্যা (১৫৯২ খ্রীঃ) প্রভৃতি রাজ্যগুলি নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। আকবর এইবার দাক্ষিণাত্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। মুঘলবাহিনী আহম্মদনগরের কিয়দংশ ও খান্দেশ অধিকার করে নেয়।

শুধু বিশাল এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেই আকবর ক্ষান্ত ছিলেন না। এর সুসাশনের জন্যও তিনি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। আকবর ছিলেন প্রজাহিতৈষী শাসক। তিনি হিন্দু মুসলমান সকল প্রজাব সাথে সমান ব্যবহার করতেন। আকবর হিন্দুদের উপর থেকে 'জিজিয়া' কর উঠিয়ে দেন। বহু রাজপুত রাজবংশের সাথে তিনি বন্ধুত্ব এমন কি বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন। হিন্দুদের তিনি উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত করেছিলেন। ধর্মের ব্যাপারে আকবর অন্যান্য মুসলমান সম্রাটদের মত গোঁড়ামি পছন্দ করতেন না। তিনি সকল ধর্মের সারমর্ম নিয়ে 'দীন-ইলাহী' নামে একটি নতুন ধর্মমত গড়ে তোলেন। শিল্পের প্রতিও আকবর যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন। ফতেপুর সিক্রীতে তিনি একটি সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর রাজসভায় বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছিল। 'আইন-ই-আকববী' গ্রন্থের রচয়িতা ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁদের অন্যতম। তাছাড়া বিখ্যাত সংগীত শিল্পী তানসেন, কবি ফৈজী, বীরবল প্রভৃতি গুণী ব্যক্তিরাও তাঁর রাজসভা অলংকৃত করতেন। তিনি তাঁর শৌর্য, বীর্য, বুদ্ধি ও উদারতা দিয়ে নবগঠিত মুঘল সাম্রাজ্যকে সুসংবদ্ধ করেছিলেন বলেই তাঁকে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

জাহাংগীর (১৬০৫-১৬২৭ খ্রীঃ) : আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জাহাংগীর সম্রাট হন। জাহাংগীরের রাজত্বকালে সুবাদার ইসলাম খাঁর সাহায্যে ঈশা খাঁ, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি বাংলার ভূঁঞাদের দমন করা হয়। জাহাংগীরের রাজত্বকালের অনেকখানি স্থান জুড়ে রয়েছেন

তাঁর পত্নী নূরজাহান। জাহাংগীরের শেষজীবনে তিনিই রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতা দখল করেছিলেন।


জাহাংগীর


শাহ্‌জাহান

শাহ্‌জাহান (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রী:) : জাহাংগীরের মৃত্যুর পর তাঁর তৃতীয় পুত্র শাহ্‌জাহান সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সময়ে বুন্দেলখণ্ডের রাজপুতগণ বিদ্রোহী হলে সেই বিদ্রোহ দমন করা হয়। বিজাপুরের সুলতান ও গোলকুণ্ডার সুলতান শাহ্‌জাহানের বশ্যতা স্বীকার করেন। তাঁর রাজত্বকালে বাংলাদেশে বিদেশী পর্তুগীজগণ ভীষণ অত্যাচার চালাতে থাকে। শাহ্‌জাহান তাদের বিরুদ্ধে এক বিরাট মুঘলবাহিনী প্রেরণ করে তাদের দমন করেন।

শাহ্‌জাহানের শাসনকাল ঐশ্বর্য ও আড়ম্বর প্রিয়তার জন্য প্রসিদ্ধ। শিল্প স্থাপত্য ও ভাস্কর্য তাঁর রাজত্বকালে চরম সমৃদ্ধি লাভ করে। কোটি কোটি অর্থ ব্যয় করে তিনি দিল্লী ও আগ্রায় যে সকল রাজপ্রাসাদ, মসজিদ, দুর্গ ও সমাধিভবন নির্মাণ করেছিলেন তা আজও দেশ-বিদেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর স্থাপত্য সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হল আগ্রার 'তাজমহল'। এছাড়া তাঁর আমলে নির্মিত মতি মসজিদ, দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, ময়ূর সিংহাসন, জাম-ই-মসজিদ প্রভৃতি

মুঘল যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের উৎকর্ষের পরিচয় বহন করছে। শাহজাহানের রাজত্বকাল মুঘল ইতিহাসের এক গৌরবময় যুগ।

শাহজাহানের শেষ জীবন ছিল বড়ই করুণ, বড়ই অশান্তির। তাঁর অসুস্থতার সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসনের দাবি নিয়ে তাঁর চারি পুত্রের (দারা, সুজা, ঔরঙ্গজীব, মুরাদ) মধ্যে এক দারুণ সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। অবশেষে ভ্রাতৃবিরোধে ঔরঙ্গজীব জয়ী হন। তিনি দারা ও মুরাদকে হত্যা করে, সুজাকে বিতাড়িত করে এবং বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করে রেখে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ঔরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীঃ): ঔরঙ্গজীব 'আলমগীর' উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান। ইসলামের নির্দেশগুলি তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। ভোগ-বিলাস তিনি পছন্দ করতেন না। যুদ্ধ বিদ্যাতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে অভিযান চালিয়ে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্য দুটি নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিয়েছিলেন।


ঔরঙ্গজেব

ঔরঙ্গজীব ধর্মান্ধ ছিলেন। যাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নি তাঁদের উপর 'জিজিয়া' ইত্যাদি কর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কোন হিন্দুকে তিনি উচ্চ রাজকার্যে নিয়োগ করতেন না। ঔরঙ্গজীবের এই অনুদার ধর্মনীতির বিরুদ্ধে মথুরার জাঠগণ বিদ্রোহী হয়। শিখগুরু তেগবাহাদুরকে হত্যা করে তিনি শিখজাতিকে শত্রুতে পরিণত করেন। ঔরঙ্গজীব তাঁর হিন্দু বিদ্বেষ দ্বারা শক্তিশালী রাজপুতগণকেও শত্রুতে পরিণত করে তুলেছিলেন। ঔরঙ্গজীবের বিরোধীদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিলেন মারাঠা নায়ক শিবাজী। শিবাজী ও মারাঠাদের সাথে সংগ্রাম ঔরঙ্গজীবের রাজত্বকালের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদনগরে রণক্লান্ত মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজীবের মৃত্যু হয়।

মুঘল যুগের সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবন

বিভিন্ন সূত্র থেকে মুঘল যুগের জীবনযাত্রার একটি চিত্র পাওয়া যায়। সম্রাট বাবর ও জাহাঙ্গীর তাঁদের স্মৃতি কথায় ভারতীয়দের জীবনযাত্রার কথা উল্লেখ করে গেছেন। আবুল ফজল রচিত 'আইন-ই-আকবরী' নামক গ্রন্থে মুঘল যুগের সুন্দর চিত্র ফুটে ওঠে। তাভার্নিয়ে, বার্ণিয়ে প্রভৃতি ভ্রমণকারীদের বিবরণ থেকেও মুঘল যুগের সমাজ জীবনের অনেক মূল্যবান তথ্য জানতে পারা যায়। মুঘল যুগে সম্রাটের স্থান ছিল সমাজ জীবনের শীর্ষে। রাজা ব্যতীত ভারতীয় সমাজ অভিজাত, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। অভিজাতবর্গ ছিল বিশেষ সম্মান ও সুযোগ সুবিধার অধিকারী। তারা বিলাসিতায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করত। মদ্য পান ও আমোদ-প্রমোদে মত্ত থেকে তারা প্রায় সমস্ত সম্পত্তিই ব্যয় করে ফেলত। মৃত্যুর পর তাদের সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হত বলে তারা সঞ্চয় করতে চাইত না। অভিজাত শ্রেণীর নীচেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তাদের উপার্জন যথেষ্ট ছিল না। তাই তারা বিলাস-ব্যসনের মধ্যে জীবন যাপন করতে পারত না।

দেশের অধিকাংশ লোকই ছিল নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। তারা দরিদ্র জীবন যাপন করত। পশমের কাপড় ও জুতো ব্যবহার তাদের সাধ্যাতীত ছিল। সাধারণতঃ তারা অনাহারে কষ্ট পেত না বটে কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় তাদের কষ্টের সীমা থাকত না। মুঘলযুগে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই কুসংস্কার বর্তমান ছিল। হিন্দুদের মধ্যে সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, পণ-প্রথা প্রচলিত ছিল। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোকই জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিল। আকবর এই সমস্ত কুপ্রথা দূর করবার চেষ্টা করেছিলেন।

মুঘল যুগে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি খুব সুবিধা দামে পাওয়া যেত। কিন্তু দরিদ্র জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা খুব ভাল ছিল না বলে, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। মুঘল যুগে সূতী ও রেশম শিল্পে খুব উন্নতি হয়েছিল। বাংলাদেশ এই দুটি শিল্পে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিল। ঢাকাই মসলিন কেবল ভারতে নয়,

সারা পৃথিবীতে প্রশংসা অর্জন করে। নীল, আফিম, মশলাপাতি প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি হত।

মুঘল যুগের কয়েকজন বিদেশী ভ্রমণকারী

মুঘল যুগে বহু বিদেশী ভ্রমণকারী ভারতে এসেছিলেন। ইংরাজ পর্যটক রালফ ফিচ আসেন আকবরের রাজত্বকালে। স্যার টমাস রো ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের দূত হিসাবে জাহাঙ্গীরের রাজসভায় এসেছিলেন। ফরাসী ব্যবসায়ী তাভার্নিয়ে এবং চিকিৎসক বার্ণিয়ে শাহাজাহানের রাজত্বকালে ভারতে আসেন। ঔরঙ্গজীবের রাজত্বকালে আসেন ইটালীয় পর্যটক মানুচি। এইসব পর্যটকদের বিবরণ থেকে মুঘল যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা জানা যায়।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন

ঔরংগজীবের মৃত্যুর পর থেকে পতনোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্য আস্তে আস্তে সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়ে। ঔরঙ্গজীব যখন মারা যান তখন তাঁর পুত্রদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে ময়াজ্জেম জয়ী হন এবং 'প্রথম বাহাদুর শাহ' বা প্রথম শাহ্ আলম নাম ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তাঁর চার পুত্রের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাধে। এই দ্বন্দ্বে জ্যেষ্ঠ পুত্র জাহান্দার শাহ জয়ী হন। কিন্তু তিনি এক বছরের মধ্যে আজিম-উস-শানের পুত্র ফারুকশিয়রের হাতে নিহত হন। এই সময়ে সৈয়দ হুসেন আলী এবং তাঁর ভ্রাতা সৈয়দ আবদুল্লা খুব প্রভাবশালী ছিলেন। ইতিহাসে তাঁরা 'সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়' নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের নির্দেশেই তখন দেশে শাসনকার্য চলত। সম্রাটেরা নামে মাত্র রাজত্ব করতেন। ফারুকশিয়র শেষ পর্যন্ত সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের শক্তিবৃদ্ধিতে শংকিত হয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ফারুকশিয়রকে হত্যা করেন। এইভাবে ফারুকশিয়রের পর আরও কয়েকজন মুঘল সম্রাট পরপর রাজত্ব করেছিলেন বটে, তবে সাম্রাজ্যের পতনকে তাঁরা রোধ করতে পারেন নি।

পতনের কারণ : মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য ঔরঙ্গজীব বহুলাংশে দায়ী ছিলেন, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর অনুদার নীতির ফলে হিন্দুরা তার শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু কোন একটিমাত্র কারণে বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের পতন হয়নি, বিভিন্ন কারণে এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল। প্রথমতঃ, ঔরংগজীব উত্তরাধিকারীগণ ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। তাঁদের মধ্যে কারও সাম্রাজ্য পরিচালনা করবার মত শক্তি কিংবা প্রতিভা ছিল না। তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন অকর্মণ্য, বিলাসী ও স্বার্থপর। তাঁদের এই দুর্বলতার সুযোগে প্রদেশগুলি একে একে স্বাধীন হয়ে উঠল। ফলে মুঘল সাম্রাজ্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। দ্বিতীয়তঃ, আমীর ওমরাহদের চারিত্রিক অবনতিও মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্য একটি কারণ। ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য মুঘল দরবারের আমীর ওমরাহদের লোভী, চক্রান্তকারী, মদ্যপ ও দুর্নীতি পরায়ণ করে তুলেছিল। ফলে সমস্ত শাসন-ব্যবস্থা পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। তৃতীয়তঃ, সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরীণ ত্রুটি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। অতিরিক্ত বিলাস-ব্যসন ও জাঁকজমকের ফলে মুঘল সৈন্য বাহিনীর শৃংখলা বিনষ্ট হয়েছিল। চতুর্থতঃ, সাম্রাজ্যের বিশালতাও মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের আর একটি কারণ। বিশাল সাম্রাজ্যকে একটি কেন্দ্র থেকে শাসন করা খুবই দুঃসাধ্য ছিল। পঞ্চমতঃ, মুঘল সাম্রাজ্যের সুদূর প্রসারিত উপকূল ভাগকে রক্ষা করবার মত উপযুক্ত নৌ-শক্তি ছিল না। ষষ্ঠতঃ, রাজকোষে অর্থাভাব মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। ঔরংগজীবের পরবর্তী মুঘল সম্রাটগণ সব সময়েই নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দে ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। এর ফলে এবং অতিরিক্ত বিলাস-ব্যসনে রাজকোষ প্রায় শূণ্য হয়ে পড়েছিল। সর্বশেষে সাম্রাজ্যে যখন ঘোর সংকটকাল উপস্থিত, তখন পরপর বৈদেশিক আক্রমণে মুঘল সাম্রাজ্য চিরতরে শ্মশানে পরিণত হল। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পারস্য সম্রাট নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেন, তাঁর আক্রমণে দিল্লী ছারখার হয়ে যায়। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদ শাহ আবদালী বা দুররাণী ভারত আক্রমণ করেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার ভারত আক্রমণ করলে সাম্রাজ্যের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও ধ্বংস হয়ে গেল।

(খ) ইউরোপীয় বণিকদের আগমন ও পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা

প্রাচ্যের সংগে প্রত্যক্ষ বাণিজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্য ইউরোপীয়গণ নতুন জলপথ আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। এই ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছিল স্পেন ও পর্তুগাল।

পর্তুগীজদের আগমন :—ভারতে প্রথম এসেছিল পর্তুগীজ বণিকেরা। ভাস্কো-দা-গামা ভারতে আসবার নতুন জলপথ আবিষ্কারের পর থেকে পর্তুগীজরা ভারতের বিভিন্ন অংশে বাণিজ্যকুঠী স্থাপন করতে থাকে। পর্তুগীজদের সম্বন্ধে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। নানা কারণে এদেশে পর্তুগীজদের আধিপত্য হ্রাস পায়।

ওলন্দাজদের আগমন :—পর্তুগীজদের পরে ভারতে আগমন করে ওলন্দাজ বণিকগণ। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজগণ ভারতের পশ্চিম উপকূলে সুরাটে একটি কুঠি স্থাপন করে। ওলন্দাজগণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আরও উপনিবেশ স্থাপন করে। এই উপনিবেশগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বাংলাদেশের চুঁচুড়া, বরাহনগর ও কাশিমবাজার, বিহারের পাটনা, উড়িষ্যার বালেশ্বর এবং দক্ষিণ ভারতের নেগাপত্তম্ ও কোচিন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ওলন্দাজদের সংগে ইংরাজদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। এর ফলে ভারতে ওলন্দাজদের বাণিজ্যিক প্রাধান্য লোপ পায়।

ইংরেজদের আগমন :—ভারতে আগমনকারী ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল ইংরেজ বণিক সম্প্রদায়। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডেররাণী এলিজাবেথ ইংলণ্ডের এক বণিক সম্প্রদায়কে ভারতে বাণিজ্য করবার সনদ দান করেন। এই বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানই 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' নামে পরিচিত। ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন হকিন্স ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস্-এর নিকট থেকে পরিচয় পত্র নিয়ে ভারতের সম্রাট জাহাংগীরের দরবারে আসেন। এর পর প্রথম জেমস্ ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধার জন্য সম্রাট জাহাংগীরের দরবারে স্যার টমাস্ রো নামে এক দূত পাঠিয়ে ছিলেন। রো-এর দৌত্য মোটামুটি সফল হয়েছিল। কয়েক বছরের মধ্যে

তারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। ঔরংগজীবের রাজত্বের শেষ ভাগে জব চার্ণক বর্তমান কলিকাতা নগরীর পত্তন করেন (১৬৯০ খ্রীঃ)। ইংরেজগণ সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কালিঘাট এই তিনটি গ্রামের জমিদারি গ্রহণ করল। ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট ফারুকশিয়ারকে বার্ষিক তিন হাজার টাকা নজরানা দানের বিনিময়ে ইংরেজ বণিকগণ বাংলাদেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করবার সুযোগ ও অন্যান্য আরও সুবিধালাভ করেছিল। এইভাবে কোম্পানির বাণিজ্য ও প্রতিপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল।

ফরাসীদের আগমন ঃ—ভারতের প্রতি ফরাসী বণিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল ঔরংগজীবের রাজত্বকালে। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই-এর মন্ত্রী কোলবার্টের চেষ্টায় সেখানে 'ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' নামে একটি বণিক সংস্থা গঠিত হয়। ফরাসী বণিকগণ ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রথম বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে সুরাটে। এর পর তারা মসুলিপত্তন, পণ্ডিচেরী, চন্দননগর, মরিসাস এবং মালাবার উপকূলের মাহেতে কুঠি স্থাপন করে। প্রথমদিকে ভারতে বাণিজ্য বিস্তার করাই ছিল ফরাসীদের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপন করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠে। ফলে সেই সময় থেকে ইংরেজদের সংগে ফরাসীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়।

অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের আগমন ঃ—পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ এবং ফরাসীগণ ছাড়াও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকগণ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে আগমন করেছিল। কিন্তু ভারতের বাণিজ্য ক্ষেত্রে তারা বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেনি।

ভারতে ইংগ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঃ—অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ভারতবর্ষে ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের মধ্যে যে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল—তা শীঘ্রই রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে পরিণত হইল। আভ্যন্তরীণ নানা কারণে ভারতবর্ষ তখন অত্যন্ত দুর্বল ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। একদিকে কর্ণাটকের সিংহাসন নিয়ে আনোয়ারউদ্দিন ও দোস্ত আলির আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বিবাদ এবং অন্যদিকে হায়দ্রাবাদের নিজাম ও

মারাঠাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে দক্ষিণ ভারতের পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করে। সেই সময়ে ইউরোপে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধের সূত্র ধরে দক্ষিণ ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয় এবং ক্রমে তা বাংলাদেশেও ছড়িয়ে পড়ে। এই ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলে। ফলে দক্ষিণ ভারতে পর পর তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়—প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধ, দ্বিতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ ও তৃতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ। কিছুদিন পরে ইউরোপের সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসান ঘটলে প্যারীর সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির ফলে ইউরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয় এবং ভারতেও ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। ফরাসীরা তাদের ঘাঁটিগুলি পুনরায় ফিরে পেয়েছিল বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে তাদের সাম্রাজ্য গঠনের আশা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেল। আর ইংরেজগণ ভারতের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল এবং ক্রমে ক্রমে এদেশের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে মনোযোগী হল।

মারাঠা শক্তির উত্থান ও বিস্তার

সপ্তদশ শতাব্দীতে মারাঠা জাতির অভ্যুত্থান ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তারা মুঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে বহু সংগ্রাম করে পরিশেষে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিল।

বিভিন্ন কারণে এই সময় মারাঠা শক্তির অভ্যুদয় ঘটেছিল। মহারাষ্ট্র দেশ দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে বিভিন্ন পর্বত দ্বারা বেষ্ঠিত ছিল। পর্বত সংকুল বলে জীবন ধারণের জন্য স্বভাবতঃই মারাঠাগণ অত্যন্ত কর্মঠ, কষ্টসহিষ্ণু ও সাহসী হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া একনাথ, তুকারাম, রামদাস প্রমুখ ধর্মসংস্কারকগণের ভক্তিবাদ প্রচারের ফলে মারাঠাদেশে জাতীয় ভাবের উন্মেষ ঘটেছিল। মারাঠা ভাষা ও সাহিত্যে মারাঠাগণকে ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত করতে সাহায্য করেছিল। সর্বোপরি মারাঠা নায়ক শিবাজীর অসাধারণ নেতৃত্বই ছিল মারাঠা-শক্তির অভ্যুদয়ের মূল প্রেরণা।

শিবাজী—১৬২৭ বা ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে পুনা জেলার শিবনের গিরিদুর্গে শিবাজীর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম শাহজী ভোঁসলে ও

মাতার নাম জিজাবাই। বাল্যকালে শিবাজী তাঁর অভিভাবক দাদাজী কোণ্ডদেবের নিকট থেকে সামরিক বিদ্যা শিক্ষা করেন। মাতার নিকট থেকে রামায়ণ ও মহাভারতের বীরত্ব কাহিনী শুনে তাঁর মনে ধর্মভাব ও দেশাত্মবোধ জাগরিত হয়েছিল। সেই সময় থেকেই তিনি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য গঠনের স্বপ্ন দেখতেন। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শিবাজী পার্বত্য অঞ্চলের দুর্ধর্ষ মাওয়ালী-গণকে নিয়ে এক বিশ্বস্ত সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। দাদাজী কোণ্ডদেবের মৃত্যুর পরে শিবাজী রাজ্য জয়ে প্রবৃত্ত হলেন।



শিবাজী

বিজাপুর রাজ্যের সঙ্গে শিবাজীর সংঘর্ষ :—মাওয়ালীগণের সাহায্যে শিবাজী বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্গত কয়েকটি দুর্গ দখল করেছিলেন। পরে শিবাজী রায়গড়ে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। এই সময়ে শিবাজীকে দমন করবার জন্য বিজাপুরের সুলতান তাঁর সুদক্ষ সেনাপতি আফজল খাঁকে প্রেরণ করেন। 'বাঘনখ' নামক ধারাল অস্ত্রের সাহায্যে শিবাজী আফজল খাঁকে হত্যা করেন। এর পর শিবাজী কোংকন প্রদেশ এবং কোলাপুর অধিকার করেছিলেন।

মুঘলদের সঙ্গে শিবাজীর সংঘর্ষ :—মারাঠা শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে ঔরঙ্গজীব তাঁর মাতুল শায়েস্তা খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। কিন্তু শিবাজীর অতর্কিত আক্রমণে শায়েস্তা খাঁ তাঁর এক পুত্র ও নিজের একটি আঙ্গুল হারিয়ে পুনা থেকে চলে গেলেন। তখন ঔরঙ্গজীব শিবাজীকে দমন করবার উদ্দেশ্যে সেনাপতি দলীর খাঁ ও অম্বরের রাজা জয়সিংহকে পাঠালেন। জয়সিংহ পুরন্দর দুর্গ অবরোধ করলে ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী তাঁর সঙ্গে 'পুরন্দরের সন্ধি' করতে বাধ্য হলেন। পরে জয়সিংহের অনুরোধে শিবাজী মুঘল দরবারে ঔরঙ্গজীবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে সেখানে তাঁকে নজর বন্দী করে রাখা হল।

কিন্তু সুচতুর শিবাজী কৌশলে নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রায়গড়ে মহা সমারোহে শিবাজীর রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়। তিনি 'ছত্রপতি' ও 'গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক' উপাধি ধারণ করেন। এইভাবে শিবাজী দক্ষিণ ভারতে একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শিবাজীর উত্তরাধিকারীগণ : শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শম্ভুজী রাজা হন। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে শম্ভুজী মুঘলদের হস্তে বন্দী হন এবং পরে তাকে হত্যা করা হয়। শম্ভুজীর নাবালক পুত্র মুঘলদের নিকট বন্দী হয়ে থাকলেন। এই সময়ে মুঘল বাহিনী কর্তৃক মারাঠা রাজধানী রায়গড় অধিকৃত হয়। এই অবস্থায় মারাঠা রাজ্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন শম্ভুজীর ভ্রাতা রাজারাম। রাজারাম শক্তিশালী সেনাবাহিনী নিয়ে ঔরংগজীবের সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে থাকেন। রাজারামের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নী তারাবাঈ নিজ শিশু পুত্র তৃতীয় শিবাজীকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্যের শাসনভার দৃঢ়হস্তে গ্রহণ করলেন। ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর শম্ভুজীর পুত্র শাহু মুক্তি পান। শাহু ফিরে এলে তারাবাঈ তাঁকে সিংহাসনে বসাতে অস্বীকার করলেন। ফলে মারাঠারা দুই দলে বিভক্ত হল। একদল শাহুকে রাজা বলে গ্রহণ করল এবং অপর দল তৃতীয় শিবাজীকে রাজা বলে ঘোষণা করল। অবশেষে দীর্ঘকাল পরে বালাজী বিশ্বনাথের চেষ্টায় মারাঠাদের মধ্যে পুনরায় ঐক্য স্থাপিত হল। ✓

পেশোয়াগণের সাম্রাজ্য গঠনের প্রয়াস:—১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে শাহু অর্থাৎ দ্বিতীয় শিবাজী বালাজী বিশ্বনাথকে পেশোয়া (প্রধান মন্ত্রী) পদে অধিষ্ঠিত করেন। সেই সময় থেকেই মহারাষ্ট্রে পেশোয়া-তন্ত্রের উৎপত্তি হয়। বালাজী বিশ্বনাথ দাক্ষিণাত্যে মারাঠা প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাছাড়া উত্তর ভারতে তিনিই মারাঠা প্রভুত্বের পথ রচনা করেন। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে, তার পুত্র প্রথম বাজীরাও পেশোয়া পদে অধিষ্ঠিত হন। এই সময় থেকেই পেশোয়াপদ বংশানুক্রমিক হয়ে দাঁড়ায়।

প্রথম বাজীরাও পেশোয়াগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন উপলব্ধি করে তিনি এক হিন্দু সাম্রাজ্য গঠনের পরিকল্পনা

করেন। কিছু দিনের মধ্যেই প্রথম বাজীরাও মালব, গুজরাট ও বুন্দেল-খণ্ডের কিয়দংশ দখল করেন। তাঁর সময়ে উত্তর ভারতেও মারাঠাদের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। এই সময়ে মারাঠাগণ পর্তুগীজদের নিকট থেকে পশ্চিম উপকূলের সলসেট ও বেসিন বন্দর কেড়ে নেয়।

বালাজী বাজীরাও ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়া পদ লাভ করেন। তিনি মালব দখল করেন। তাঁর সময়ে মহীশূরের কিয়দংশ ও কর্ণাটক মারাঠা সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। বালাজী বাজীরাও-এর রাজত্বকালে মারাঠা সাম্রাজ্যের সর্বাধিক উন্নতি হয়েছিল।

পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ : এই সময়ে পেশোয়ার ভ্রাতা রঘুনাথ রাও উত্তর ভারতে অভিযান চালিয়ে পাঞ্জাব দখল করেন। স্বভাবতই আহম্মদ শাহ্ আবদালী এতে ক্রুদ্ধ হন। এই মারাঠা বাহিনীর সাথেই ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের ঐতিহাসিক প্রান্তরে তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ 'পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ' নামে পরিচিত। আহম্মদ শাহ্ আবদালীর সমর কৌশলের নিকটে মারাঠারা শেষ পর্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে তাদের হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন চিরতরে বিলীন হয়ে গেল।

শিখ জাতির উত্থান ও পতন

পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গুরু নানক (১৪৬৯—১৫৩৮ খ্রীঃ) যে ধর্মমত প্রচার করেন, তার ফলে শিখ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। নানকের পরবর্তী তিনজন শিখগুরু অঙ্গদ, অমরদাস ও রামদাস শান্তিপ্রিয় ধর্মপ্রচারক ছিলেন। রাজনীতির সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক ছিল না। শিখগণের পঞ্চম গুরু অর্জুন-এর সময় থেকে শিখগুরুর পদ বংশানুক্রমিক হয়ে যায়। 'গ্রন্থ সাহেব' নামে খ্যাত শিখগণের আদি ধর্মগ্রন্থ তিনিই প্রথমে প্রচার করেন। গুরু অর্জুন রাজনীতির সঙ্গেও জড়িত হয়ে পড়েন। জাহাঙ্গীরের পুত্র খসরু পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে গুরু অর্জুন খসরুকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেন। জাহাঙ্গীর এই অপরাধে গুরু অর্জুনকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত

করেন। তিনি অর্থদানে অসম্মত হলে জাহাঙ্গীর ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন (১৬০৬ খ্রীঃ)। এই ঘটনায় শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুতর আলোড়ন উপস্থিত হয়। অর্জুনের পুত্র ষষ্ঠ শিখগুরু হরগোবিন্দ (১৬০৬—১৬৪৫ খ্রীঃ) আত্মরক্ষার্থে শিখ সম্প্রদায়কে সশস্ত্র যোদ্ধায় পরিণত করলেন। গুরু হরগোবিন্দের পরবর্তী সপ্তম শিখ গুরু হররায় (১৬৪৫—১৬৬১ খ্রীঃ) শাহজাহানের পুত্রগণের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হলে দারাশিকোর পক্ষ সমর্থন করেন। এর ফলে ঔরঙ্গজীব শিখগণের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। অষ্টম গুরু হরকিষাণের (১৬৬১—১৬৬৪ খ্রী:) সময় উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটেনি। নবম গুরু তেগ বাহাদুর (১৬৬৪—১৬৭৫ খ্রীঃ) ঔরংগজীবের প্রবর্তিত কতকগুলি ধর্মনীতির বিরোধিতা করে তাঁর বিশেষ বিরাগ ভাজন হন। ঔরঙ্গজীব তাঁকে রাজদ্রোহের অভিযোগে বন্দী করেন এবং হয় ইসলামধর্ম গ্রহণ না হয় মৃত্যু বরণ করতে বলেন। গুরু তেগ বাহাদুর ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হলে ঔরংগজীবের আদেশে দিল্লীতে প্রকাশ্য দরবারে তাঁর মস্তক ছেদন করা হয়। তেগ বাহাদুরের পুত্র দশম ও শেষ শিখ গুরু গোবিন্দসিংহ (১৬৭৫—১৭০৮ খ্রীঃ) শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করলেন। পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে তিনি 'খালসা' নামে ধর্মভিত্তিক সামরিক বাহিনী প্রতিষ্ঠা করলেন। শিখগণের মধ্যে জাতিভেদ নিষিদ্ধ করে গুরুগোবিন্দ আদেশ দিলেন যে প্রত্যেক শিখের উপাধি হবে 'সিংহ'। তিনি নির্দেশ দিলেন যে প্রত্যেক শিখ পুরুষকে পঞ্চ 'ক' ধারণ করতে হবে। এই পঞ্চ 'ক' হল—কেশ, কঙ্কতী, কঙ্কণ, কঞ্চুক ও কৃপাণ। এইরূপে শিখরা খালসা অর্থাৎ পবিত্র হল। নতুন বেশ, নতুন আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণ করে এক সুসংবদ্ধ সামরিক জাতিতে পরিণত হল।

কালক্রম

মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা	১৫২৬ খ্রীঃ
ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠন	১৬০০ খ্রীঃ
কলিকাতা নগরীর পত্তন	১৬৯০ খ্রীঃ
ঔরংগজীবের মৃত্যু	১৭০৭ খ্রীঃ

অনুশীলনী

নিবন্ধমূলক প্রশ্ন

১। বাবর কিভাবে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন ?

২। শেরশাহ ইতিহাসে বিখ্যাত কেন ?

৩। আকবরকে কেন মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় ?

৪। শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালকে মুঘল ইতিহাসের গৌরবময় যুগ বলে কেন ?

৫। ঔরঙ্গজীবের রাজত্বকাল বর্ণনা কর।

৬। মুঘল যুগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা কর।

৭। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি উল্লেখ কর।

৮। ভারতে ইউরোপীয় বণিকদের আগমন সম্বন্ধে কি জান উল্লেখ কর।

৯। শিবাজীর নেতৃত্বে কিভাবে মারাঠা শক্তির উত্থান হয়েছিল ?

১০। শিখ জাতির উত্থান ও সংগঠন সম্বন্ধে যা জান লেখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কে, কবে করেন ?

২। পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কবে এবং কাদের মধ্যে হয়েছিল ?

৩। বৈরাম খাঁ কে ছিলেন ?

৪। হলদিঘাটের যুদ্ধ কত সালে এবং কাদের মধ্যে হয়েছিল ?

৫। 'দীন-ই-ইলাহী' কি ?

৬। শাহ্‌জাহানের আমলে স্থাপত্য শিল্পের কয়েকটি উদাহরণ দাও।

৭। শিবাজী কখন, কি উপাধি ধারণ করেছিলেন ?

৮। শিখদের পঞ্চ-ক কি কি ? কে এটা প্রবর্তন করেন ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

(ক) ——কে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

(খ) 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন ——।

(গ) —— কলিকাতা নগরীর পত্তন করেছিলেন।

(ঘ) শিবাজীর অভিভাবক ছিলেন ——।

(ঙ) শিখ ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন ——।

সপ্তম অধ্যায়

॥ ভারতে বৃটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ॥

(১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত)

(ক) প্রথম স্তর (১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত)—দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটককে কেন্দ্র করে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। কিন্তু কর্ণাটকের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর থেকেই ফরাসী প্রভাব কমে আসে। ইংরাজরা তখন একদিকে বাণিজ্য ও অন্যদিকে সাম্রাজ্য বিস্তারের দ্বারা নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টায় লিপ্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লর্ড ক্লাইভ থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লর্ড ডালহৌসীর শাসনকাল পর্যন্ত ক্রমাগত ইংরেজরা এদেশে শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে।

রবার্ট ক্লাইভ ও ইংরেজ শক্তি বৃদ্ধি—ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হলেন রবার্ট ক্লাইভ। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে সামান্য কেরাণীর কাজ নিয়ে ভারতে আসেন। পরে তিনি সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন এবং অল্পদিনের মধ্যে স্বীয় কর্ম-দক্ষতায় উচ্চপদে উন্নীত হন। পরে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তিনি বাংলাদেশে আসেন। তাঁর কৃতিত্বের ফলে দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটকে আর বাংলাদেশে ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়।



রবার্ট ক্লাইভ

সিরাজদ্দৌলা (১৭৫৬-১৭৫৭ খ্রীঃ)—নবাব আলিবর্দি খাঁ মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রিয় দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলাকে তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে যান। কিন্তু সিরাজের আত্মীয়েরা প্রবলভাবে তাঁর সিংহাসন লাভের বিরোধিতা করেন। সেনাপতি মিরজাফর নিজের স্বার্থে

সিরাজকে সিংহাসন থেকে অপসারণের চক্রান্তে লিপ্ত হন। এতে ধনকুবের, উমিচাঁদ, জগৎশেঠ প্রভৃতি ব্যক্তিরাও যোগ দেন।



সিরাজদ্দৌলা

ইংরেজরা সিরাজের কতকগুলি নির্দেশ অমান্য করায় সিরাজ ইংরেজদের উপর ক্ষুব্ধ হন। ইংরেজরাও বুঝতে পেরেছিল যে স্বাধীনচেতা সিরাজকে সিংহাসন থেকে অপসারণ না করতে পারলে তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। তাই ইংরেজরা সিরাজের প্রতিপক্ষদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেদের ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা করল।

পলাশীর যুদ্ধ (১৫ই জুন, ১৭৫৭ খ্রীঃ)—সামান্য এক অজুহাত দেখিয়ে ক্লাইভ নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজ বাহিনী নবাব বাহিনীর সম্মুখীন হয়। নবাবের পক্ষে ছিল প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য, অন্যদিকে ক্লাইভের ছিল মাত্র তিন হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য। এই সামান্য সৈন্য নিয়ে তিনি নবাবের বিরাট বাহিনীর মোকাবিল করেন। নবাবের প্রধান সেনাপতি ষড়যন্ত্রী মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা করেন। তাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভের জয় এবং নবাবের পরাজয় হল। এই যুদ্ধের ফলে ইংরেজদের শক্তি খুবই বৃদ্ধি পেল।



মীরজাফর

মীরজাফর (১৭৫৭-৬০ খ্রীঃ) এবং (১৭৬৪-৬৫ খ্রীঃ)—সিরাজদ্দৌলার পরে মীরজাফর বাংলার নবাব হন। তিনি ইংরেজদের কলিকাতা ও চব্বিশ পরগণার জমিদারি ছেড়ে দেন। কিন্তু অর্থলোভী ইংরেজরা ক্রমাগতই মীরজাফরের উপরের বেশী অর্থের জন্য

চাপ দিতে থাকে। এই অবস্থায় মীরজাফর ইংরেজদের কবল থেকে মুক্ত হতে ওলন্দাজদের সংগে ষড়যন্ত্র করলেন। ফলে তিনি পদচ্যুত হন। মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিমকে বাংলার নবাবী দেওয়া হয়।

মীরকাশিম (১৭৬০-৬৪ খ্রীঃ)—মীরকাশিম স্বাধীনচেতা নবাব ছিলেন। পদে পদে ইংরেজদের কর্তৃত্বে তিনি অসন্তুষ্ট হয়েওঠেন। শীঘ্রই তাঁর সংগে ইংরেজদের সংঘর্ষ শুরু হয়। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ইংরেজ বণিকেরা বিনা শুল্কে বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছিল। কিন্তু এদেশীয় বণিকেরা তা থেকে বঞ্চিত ছিল। এইবার মীরকাশিম তাদেরকেও অবাধ বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা দিলেন। এতে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের সংগে মীরকাশিমের বিবাদ উপস্থিত হয়। শীঘ্রই এই বিবাদ যুদ্ধে পরিণত হল। এই যুদ্ধ 'বক্সারের যুদ্ধ' (১৭৬৪ খ্রীঃ) নামে খ্যাত।



মীরকাশিম

এই যুদ্ধে অযোধ্যার নবাব এবং দিল্লীর বাদশাহ মীরকাশিমকে সাহায্য করলেও শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা জয়ী হল। এই যুদ্ধের পর ইংরেজদের ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপনের সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ—বক্সারের যুদ্ধের পর কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ক্লাইভ পুনরায় বাংলাদেশে আসেন। অযোধ্যার নবাব মীরকাশিমের সংগে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন বলে ক্লাইভ তাঁর নিকট থেকে কারা ও এলাহাবাদ প্রদেশ ও ২৬ লক্ষ টাকা আদায় করলেন। ঐ কারা ও এলাহাবাদ প্রদেশ এবং বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা মুঘল সম্রাটকে দিয়ে বিনিময়ে তিনি মুঘল সম্রাটের নিকট থেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করলেন (১৭৬৫ খ্রীঃ)। অর্থাৎ এইসব অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের ভার কোম্পানীর হাতে এল। এইভাবে কোম্পানী ও নবাবের মধ্যে শাসন ক্ষমতা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। ইতিহাসে ইহা 'দ্বৈত শাসন' নামে খ্যাত। এই শাসন ব্যবস্থার ফলে বাংলাদেশের মানুষের দুর্দিন

শুরু হল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা দিল এক অরাজকতা। ফলে ১৭৭০ খ্রীঃ (বাংলা ১১৭৬ সন) বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা গেল। দেওয়ানী লাভের পরে কোম্পানীর প্রভাব ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে লাগল।

ওয়ারেন হেস্টিংস—১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলায় গভর্ণর হয়ে এলেন। তাঁর সময়েই মহীশূরের হায়দর আলী ও মারাঠাদের সংগে ইংরেজের যুদ্ধের সূচনা হয়।



ওয়ারেন হেস্টিংস



হায়দর আলী

ইংরেজ কোম্পানী ও মহীশূর রাজ্য—অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে হায়দর আলী ক্ষুদ্র মহীশূর রাজ্যকে একটি প্রধান শক্তিতে পরিণত করেন। তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শংকিত হয়ে ইংরেজরা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। মহীশূরের সংগে ইংরেজদের চারবার যুদ্ধ হয়।

হায়দর কর্তৃক আর্কট আক্রমণ করার ফলে ইংরেজদের সংগে মহীশূর রাজ্যের প্রথম যুদ্ধ শুরু হয়। প্রথম যুদ্ধে (১৭৬৬-৬৯) কোন পক্ষেরই বিশেষ লাভ হয় নি। সাময়িকভাবে উভয়ের মধ্যে একটি সন্ধি হয়। কিন্তু সন্ধির মেয়াদ খুব বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। হায়দরের সঙ্গে ইংরেজদের আবার বিরোধ বাধল। ফলে দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ (১৭৮০-৮৪) শুরু হল। প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে হায়দর নিহত হলেন (১৭৮২ খ্রীঃ)। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর সুযোগ্য পুত্র টিপু সুলতান মহীশূরের নবাব হয়ে

ঐ যুদ্ধ চালাতে থাকেন এবং পরে ইংরেজদের সঙ্গে একটি সন্ধি করেন। এর ফলে দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

টিপু ছিলেন স্বাধীনচেতা ও দৃঢ় মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তি। ভারতে ইংরেজ শক্তির বিস্তার রোধ করাই ছিল তাঁর প্রধান সংকল্প। এজন্য তিনি ফরাসীদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন।



টিপু সুলতান

ম্যাঙ্গালোরে টিপুর সঙ্গে ইংরেজদের একটি সন্ধি হয়েছিল। তথাপি টিপুর শক্তি বৃদ্ধি ইংরেজদের কাছে ক্রমশঃ আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৭৯০ সালে টিপু ইংরেজদের ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করলে তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধ (১৭৯০-৯২) শুরু হয়। তৎকালীন ইংরেজ শাসনকর্তা লর্ড কর্ণওয়ালিশ টিপুর বিরুদ্ধে নিজাম ও মারাঠাদের সঙ্গে চুক্তি করলেন। সম্মিলিত তিন বাহিনী টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তম অবরোধ করলে বাধ্য হয়ে টিপু ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করলেন।

১৭৯৯ সালে লর্ড ওয়েলসলি পুনরায় টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তম অধিকৃত হয়। টিপু যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতই মৃত্যুবরণ করেন। ফলে সমগ্র মহীশূর রাজ্য ইংরেজদের অধিকারে আসে।

ইংরেজ ও মারাঠাদের সংঘর্ষ :—মহীশূরের মতই দক্ষিণ ভারতে ইংরেজদের আধিপত্য স্থাপনের ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা ছিল মারাঠারা। ইংরেজদের সঙ্গে এই মারাঠাদের দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষ চলেছিল।

পেশোয়ার প্রথম মাধব রাওয়ের সুগঠিত নেতৃত্বে মারাঠারা লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে। তাঁর মৃত্যুর পরে মারাঠাদের মধ্যে দুর্বলতা ও অনৈক্য প্রকাশ পায়। প্রথম মাধব রাওয়ের পরবর্তী পেশোয়া হন নারায়ণ রাও। তিনি রঘুনাথ রাওয়ের প্ররোচনায় আততায়ীর হাতে

প্রাণ হারালেন। অধিকাংশ মারাঠা নায়ক নারায়ণ রাওয়ের শিশুপুত্রকে পেশোয়া পদে অভিষিক্ত করতে মনঃস্থ করলেন। অপর পক্ষে নারায়ণ রাওয়ের পিতৃব্য রঘুনাথ রাও নিজেকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করেন ও ইংরেজদের সাহায্য চান। মারাঠা রাজ্যে হস্তক্ষেপ করবার এরূপ স্বর্ণ সুযোগ ইংরেজরা ছাড়ল না। এইভাবে ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে প্রথম যুদ্ধের (১৭৭৫-৮২) সূচনা হল। মারাঠা নায়ক নানা ফড়নবীশ ও মাধবজী সিন্ধিয়ার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মারাঠারা দৃঢ়তার সঙ্গে ইংরেজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। শেষ পর্যন্ত মাধবজী সিন্ধিয়া ইংরেজদের সাথে সন্ধি করেন (১৭৮২ খ্রী)। এই সন্ধির ফলে ইংরেজরা রঘুনাথ রাওকে পেশোয়া পদে বসাতে পারল না, কিন্তু মারাঠাদের কাছ থেকে সলসেটি দ্বীপটির অধিকার লাভ করল। এইভাবে প্রথম মারাঠা যুদ্ধের অবসান হল।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধ শুরু হল। এই সময়ে ভারতের গভর্ণর ছিলেন ওয়েলেসলি। তাঁর অধীনতামূলক মিত্রতা নীতিকে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও মেনে নিলেও অন্যান্য মারাঠা নেতারা তা মানলেন না। তাঁরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন। সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা যুদ্ধে যোগদান করলেও হোলকার কিন্তু তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন না। ফলে মারাঠাদের মধ্যে ঐক্য না থাকায় মারাঠা নায়কগণ একে একে ইংরেজদের নিকট পরাজিত হলেন।

এই যুদ্ধের পর মারাঠারা খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সুযোগ বুঝে ইংরেজরা মারাঠা রাজ্যগুলির উপর তাদের প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। অপমানে ও ক্ষোভে ভোঁসলা ও হোলকার আবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হল তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ এবারও ঐক্যের অভাবে সকলের পরাজয় হল। এইভাবে দক্ষিণ ভারতে ইংরেজদের সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ সুগম হয়।

লর্ড ওয়েলেসলী ও অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি—ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য প্রসারের উদ্দেশ্যে লর্ড ওয়েলেসলি একটি সুপরিকল্পিত সাম্রাজ্যবাদী কৌশল গ্রহণ করেন। এটি 'অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি' নামে অভিহিত। এই নীতি অনুসারে স্থির হয়, কোন রাজা কোম্পানীর সঙ্গে

মিত্রতা করলে কোম্পানী তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্যে করবে। তবে প্রত্যেক মিত্র রাজাকে কোম্পানীর কতকগুলি শর্ত মানতে হবে। এই শর্তগুলি হল—প্রত্যেক মিত্র রাজ্যে বৃটিশ সৈন্য থাকবে এবং সেই সৈন্য বাহিনীর ব্যয় মিত্র রাজ্যকে বহন করতে হবে। মিত্র রাজ্যে 'রেসিডেণ্ট' নামে একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী থাকবেন। কোন বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে মিত্র রাজার সন্ধি বা যুদ্ধ করবার অধিকার থাকবে না। ইংরেজ ব্যতীত অন্য কোন ইউরোপীয়কে চাকরী দেওয়া চলবে না। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় 'অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি' গ্রহণ করলে কোন দেশীয় রাজার স্বাধীনতা বলে কিছু থাকে না। তবুও ১৭৯৮ সালে নিজাম অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণ করেন। এইভাবে লর্ড ওয়েলেসলীর কূটনীতির ফলে ভারতের বহু শক্তিমান রাজার পতন হয়।

পরবর্তী স্তর—১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত

ইংরেজ ও শিখ জাতির সংঘর্ষ—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত শিখগণ বারোটি দল অথবা 'মিসূলে' বিভক্ত ছিল। সুকেরচাকিয়া নামে একটি মিসূলের দলপতি ছিলেন মহাসিংহ। তাঁর পুত্র ছিলেন পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ। রণজিৎ সিংহের সুগঠিত নেতৃত্বে শিখ জাতির মধ্যে নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল।

রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে শিখ জাতির জাগরণ—রণজিৎ সিংহ ছিলেন বুদ্ধিমান, সুচতুর এবং রণকুশলী। মাত্র বারো বছর বয়সে পিতৃহারা রণজিৎ সিংহ সুকেরচাকিয়া মিসূলের দলনায়ক হলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শিখ মিসূলগুলি একত্রিত করে এক বিশাল শক্তিশালী শিখ সাম্রাজ্য গঠন করা। তাই তিনি শতদ্রু নদীর পশ্চিমপারের শিখমিসূলগুলি জয় ও ঐক্যবদ্ধ করলেন। পরে তিনি শতদ্রুর পূর্ব পারের অঞ্চল-গুলি অধিকার করতে অগ্রসর হলে কতিপয় শিখ রাজ্যের নায়কগণ


রণজিৎ সিংহ

ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। ইংরেজরা যুদ্ধে অগ্রসর হলেও শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। এটি 'অমৃতসরের সন্ধি' নামে খ্যাত। এই সন্ধির চুক্তি অনুসারে রণজিৎ সিংহ শতদ্রুর পূর্ব তীরে আর অগ্রসর না হয়ে ঐ নদীর পশ্চিমে সাম্রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হন। একে একে কাশ্মীর, মুলতান ও পেশোয়ার তাঁর অধিকৃত হয়। এইভাবে রণজিৎ সিংহ ভারতে এক বিশাল শিখ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

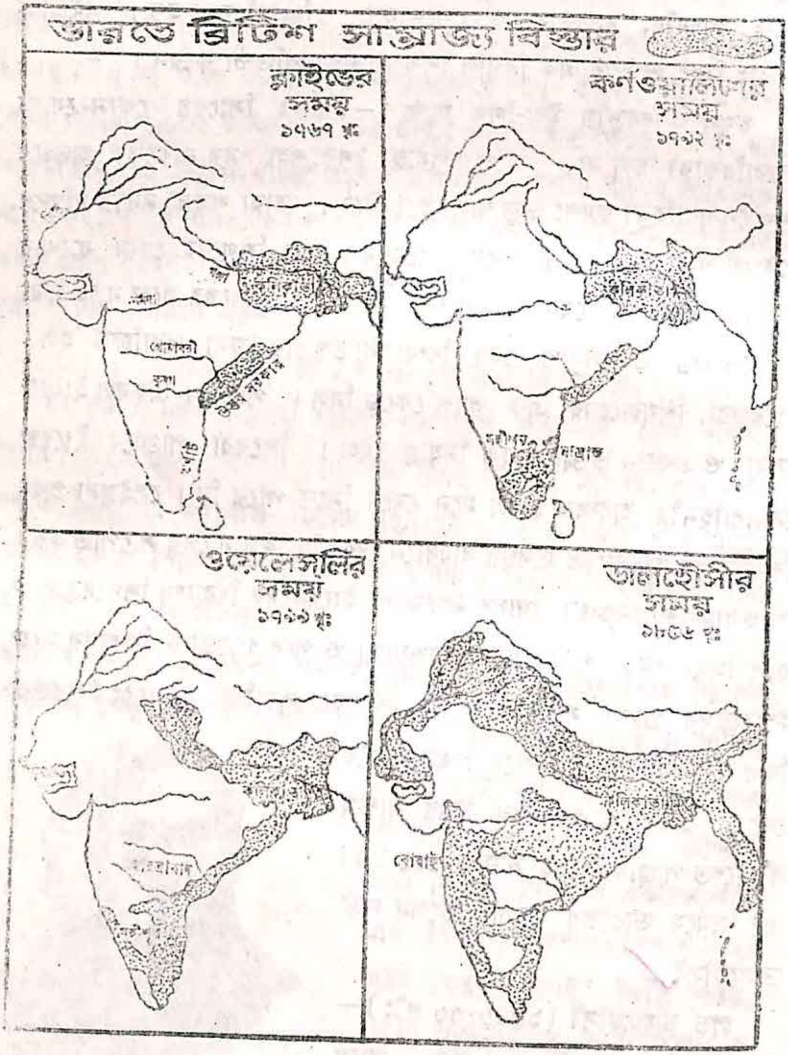
প্রথম ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ :— রণজিৎ সিংহের কোন যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিল না। ফলে উপযুক্ত রণকুশল সমর নায়কের অভাবে শিখ সৈন্যবাহিনী ক্রমশঃ উচ্ছৃংখল হয়ে উঠে। তারা শতদ্রু নদীর দক্ষিণে লুঠপাট শুরু করে। এর ফলে ইংরেজদের সঙ্গে শিখদের প্রথম যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। শিখেরা অসামান্য সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও মন্ত্রী ও সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য পরাজিত হল। ইংরেজরা শিখরাজ্যের এক অংশ কেড়ে নিল। পাঞ্জাবে একদল ইংরেজ সৈন্য ও একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রইল। শিখেরা পাঞ্জাবে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর অবস্থান প্রসন্ন মনে মেনে নিতে পারে নি। সেইজন্য প্রথম শিখযুদ্ধের অবসানের দুবছর ব্যবধানে দ্বিতীয় শিখ যুগের সূত্রপাত হয়। আফগান শাসনকর্তা দোস্ত মহম্মদও ইংরেজদের বিরুদ্ধে শিখদের সঙ্গে হাত মিলালেন। প্রথমে চিলিয়ানওয়ালা ও পরে গুজরাটে শিখদের সঙ্গে ইংরেজদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলে। শিখেরা পরাজিত হয় এবং ইংরেজরা শিখ সৈন্যদলকে একেবারে বিধ্বস্ত করে দেয়। এইভাবে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে পাঞ্জাব ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এই সময়ে ভারতের বড়লাট ছিলেন লর্ড ডালহৌসী।



লর্ড ডালহৌসী

লর্ড ডালহৌসী (১৮৪৮-৫৬ খ্রীঃ)— লর্ড ডালহৌসী ছিলেন মনে প্রাণে সাম্রাজ্যবাদী। ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের বিস্তার ও একে দৃঢ় করার ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশী। তিনিও

লর্ড ওয়েলেসলীর মত একটি নতুন সাম্রাজ্যবাদী কৌশল গ্রহণ করেন। তাঁর সেই কৌশল ইতিহাসে 'স্বত্ববিলোপ নীতি' নামে খ্যাত। এই নীতির মূল কথা হ'ল—যদি ইংরেজদের সাহায্য পুষ্ট কোন রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা যান, তবে তাঁর রাজ্যটি কোম্পানীর অধিকারভুক্ত



হবে। অপুত্রক রাজা কোন দত্তক পুত্র গ্রহণ করলে সেই দত্তক পুত্রকে রাজা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না। লর্ড ডালহৌসীর এই নীতির ফলে সাতারা, জয়পুর, উদয়পুর, ঝাঁসী প্রভৃতি রাজ্য ইংরেজের অধিকারে আসে।

(গ) সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭ খ্রীঃ)—ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর পুঞ্জীভূত বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৮৫৭ এর সিপাহী বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। সেইজন্য এই বিদ্রোহের ঐতিহাসিক গুরুত্ব খুবই বেশী।

সিপাহী বিদ্রোহের কারণ :—এই বিদ্রোহের কারণগুলিকে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে বিচার করা চলে।

রাজনৈতিক কারণ :—ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজদের ভারত-জোড়া সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ তখনও জীবিত ছিলেন। তাঁর 'সম্রাট' উপাধি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়। মুসলমান সম্প্রদায় এই ঘটনায় ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে খুবই বিরূপ হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়তঃ, মারাঠা পেশোয়া দ্বিতীয় বাজী রাওয়ের দত্তক পুত্র নানাসাহেব এবং ঝাঁসীর রাজার দত্তক পুত্রকেও সিংহাসনের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। এতে নানাসাহেব এবং ঝাঁসীর বিধবা রাণী লক্ষ্মীবাঈ ইংরেজের বিরুদ্ধে চলে যান। অযোধ্যা রাজ্যটি সুশাসিত হচ্ছে না এই অজুহাত দেখিয়ে লর্ড ডালহৌসী সেটি ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ফলে ঐ রাজ্যের হিন্দু-মুসলমান প্রজাগণ তাতে খুবই আঘাত পায় এবং ইংরেজ বিরোধী হয়ে ওঠে।

সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ :—সতীদাহ প্রথা রদ, বিধবা বিবাহের প্রবর্তন, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার, রেলপথের বিস্তার প্রভৃতি সংস্কার মূলক প্রচেষ্টাগুলি রক্ষণশীল হিন্দুরা সুনজরে দেখতে পারেনি। দ্বিতীয়তঃ, খ্রীষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ এবং খ্রীষ্টান ধর্মের প্রচারের চেষ্টা হিন্দু-মুসলমান সর্বশ্রেণীর ভারতবাসীর নিকটে সন্দেহের উদ্রেক করে। তাদের মনে তখন এই ধারণা জন্মায় যে, ইংরেজরা এদেশের সকল অধিবাসীকে খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করবে।

অর্থনৈতিক কারণ :—সিপাহী বিদ্রোহের কতকগুলি অর্থনৈতিক কারণও বর্তমান ছিল। প্রথমতঃ, ইংরেজরা ভারতীয় ধনসম্পদ ইংলণ্ডে প্রেরণ করত এবং ইংলণ্ডে প্রস্তুত নানা দ্রব্য ভারতে এনে বিক্রি করত। ফলে এদেশীয় শিল্প বাণিজ্যের প্রভূত ক্ষতি হত। দ্বিতীয়তঃ, দেশীয় রাজাদের বহু রাজ্য ইংরেজ-সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ায় সেই রাজ্যের অনুচর,

কর্মচারী ও সৈন্যগণ বেকার হয়ে পড়েছিল। ফলে তাদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়েছিল। তৃতীয়তঃ, উচ্চযোগ্যতাসম্পন্ন ভারতীয়দের চেয়েও নিম্নমানের ইংরেজ রাজকর্মচারীদের অধিক বেতন দেওয়া হত।

সামরিক কারণ :—ইংরাজ সৈন্যবাহিনীতে ভারতীয় সিপাহীর সংখ্যাই বেশী ছিল, কিন্তু পদমর্যাদা ও বেতনের দিক থেকে তাদের উপর অবিচার করা হত। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় সিপাহীরা অন্য দেশে যুদ্ধ করতে গেলে ইংরেজ সিপাহীদের মত বিশেষ কোন ভাতা পেত না।

প্রত্যক্ষ কারণ :—সিপাহী বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল 'এনফিল্ড' নামে একপ্রকার রাইফেলের প্রচলন। এই রাইফেলের টোটাগুলি চর্বি নির্মিত মোড়কে ঢাকা থাকত এবং তা দাঁতে কেটে রাইফেলে ভরতে হত। সাধারণ সিপাহীদের মধ্যে এক গুজব রটে গেল যে, এনফিল্ড রাইফেলের টোটায় গরু ও শূকরের চর্বি মিশানো আছে। এদেশীয় সিপাহীদের জাতিনাশ করার জন্যই ইংরেজরা যে এইরূপ অস্ত্র আমদানি করেছে সে বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীদের কোন সন্দেহ রইল না। তখন জাত যাবার আশংকায় তারা সকলে বিদ্রোহ ঘোষণা করল।

বিদ্রোহের প্রকৃতি :—বাংলাদেশের ব্যারাকপুরের সিপাহীরাই সর্বপ্রথম বিদ্রোহ করেছিল মঙ্গল পাণ্ডে নামে একজন সিপাহীর নেতৃত্বে। দেখতে দেখতে এই বিদ্রোহের আগুন আম্বালা, মীরাট, লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা প্রভৃতি সামরিক নিবাসে ছড়িয়ে পড়ল। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, নানাসাহেব, তাঁতিয়াতোপী প্রভৃতিরা ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিলেন। কিন্তু তবুও প্রায় এক বছরের মধ্যেই ইংরেজরা তৎপরতার সঙ্গে এতবড় বিদ্রোহের অবসান ঘটাল।



ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ

এই বিদ্রোহ জাতীয় অন্দোলন না নিছক সিপাহী বিদ্রোহ এ নিয়ে

ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এই বিদ্রোহ নিছক সিপাহী বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, সিপাহীদের নিজস্ব অভাব-অভিযোগের ভিত্তিতেই তারা এই বিদ্রোহ করেছিল। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিকের মতে এই বিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পদক্ষেপ।

সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ—বিভিন্ন কারণে ১৮৫৭-র মহা-বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল। প্রথমতঃ, এই বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, এই বিদ্রোহের আদর্শ ও কর্মপন্থায় যথেষ্ট অমিল ছিল। তৃতীয়তঃ, এই বিদ্রোহ সর্বভারতীয় রূপ লাভ করতে পারেনি। চতুর্থতঃ, অধিকাংশ দেশীয় রাজ্য, উচ্চ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়, গোর্খা ও শিখ সিপাহীরা এই বিদ্রোহে যোগ দেয়নি। পঞ্চমতঃ, বিদ্রোহীদের কাছে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের খুব অভাব ছিল এবং আধুনিক সমর কৌশল সম্বন্ধেও তাদের ধারণা ছিল কম।

(ঘ) বৃটিশ শাসনের ফলাফল—রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসন্তোষ

ইংরেজ শাসনের ফলে ভারতবর্ষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে। পরাধীনতার অভিশাপরূপে ভারতবাসীকে ইংরেজ শাসনের কুফল ভোগ করতে হয়েছিল। ইংরেজ শাসকগণ ভারতবাসীকে মোটেই সুনজরে দেখেননি। তাঁরা ভারতবাসীর কোনপ্রকার দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন নি। পক্ষান্তরে সমস্ত উচ্চপদে ইউরোপীয়দের নিয়োগ করতেন। এইসব বৈষম্যমূলক আচরণ ভারতীয়দের অসন্তোষ বৃদ্ধি করেছিল। গোড়ারদিকে কোম্পানীর শাসনের কুফল হিসাবে বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। ইংরেজদের বঞ্চনার নীতির ফলে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেশীয় নৃপতিদের মনেও বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ইংরেজদের শোষণ অব্যাহত ছিল। ভারতে ইংরেজ বণিকের অবাধ বাণিজ্য এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের অবৈধ বাণিজ্যের ফলে দেশীয় বণিকদের বাণিজ্য একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে তারা অধিকাংশই বেকার হয়ে পড়ে। এক সময়ে ঢাকার মসলিন কাপড় ছিল জগদ্বিখ্যাত। কিন্তু ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লবের ফলে কলে প্রস্তুত কাপড়ের সহিত বাংলার তাঁতের কাপড় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকতে পারল না। ভারতীয় বস্ত্র শিল্পীদের আর্থিক অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে পড়ল।

কালক্রম	
পলাশীর যুদ্ধ	১৭৫৭ খ্রীঃ
বক্সারের যুদ্ধ	১৭৬৪ খ্রীঃ
ইংরেজদের দেওয়ানী লাভ	১৭৬৫ খ্রীঃ
শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি	১৭৯২ খ্রীঃ
অমৃতসরের সন্ধি	১৮০৯ খ্রীঃ
সিপাহী বিদ্রোহ	১৮৫৭ খ্রীঃ

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। ভারতে ইংরেজ আধিপত্য কিভাবে স্থাপিত হয়েছিল ?

২। সিরাজদ্দৌলা কে ছিলেন ? তাঁর সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ বাধে কেন ?

৩। মীরজাফর থেকে মীরকাশিম পর্যন্ত ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে বাংলার নবাবদের সম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪। ভারতে ইংরেজ শক্তি প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে রবার্ট ক্লাইভের ভূমিকা কি ?

৫। ইঙ্গ-মহীশূর বিবাদের ইতিহাস সংক্ষেপে লেখ।

৬। মারাঠাদের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধের সূত্রপাত কিভাবে হয়েছিল ?

৭। রণজিৎ সিংহ সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৮। সিপাহী বিদ্রোহের বিভিন্ন কারণগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর মূলক প্রশ্ন

১। কম কথায় নিম্নের বিষয়গুলির সম্বন্ধে আলোচনা কর—
(ক) পলাশীর যুদ্ধের গুরুত্ব, (খ) বক্সারের যুদ্ধ, (গ) অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি, (ঘ) কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ, (ঙ) স্বত্ব বিলোপ নীতি, (চ) টিপু সুলতান, (ছ) সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ, (জ) সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃতি।

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। দু'এক কথায় উত্তর দাও—

(ক) বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব কে ?

(খ) ইংরেজরা কত খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ানী লাভ করে ?

(গ) প্রথম ইঙ্গ মারাঠা যুদ্ধ কবে শুরু হয়েছিল ?

(ঘ) অধীনতা মূলক মিত্রতা নীতি কে প্রবর্তন করেন ?

(ঙ) স্বত্ব বিলোপ নীতি কে প্রবর্তন করেন ?

(চ) মঙ্গল পাণ্ডে কে ছিলেন ?

(ছ) সিপাহী বিদ্রোহ প্রথম কোথায় শুরু হয়েছিল ?

অষ্টম অধ্যায়

॥ অষ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ (যুক্তিবাদের যুগ) ॥

ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগকে বলা হত অন্ধ বিশ্বাসের যুগ। কিন্তু আধুনিক যুগ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৃষ্টি ভঙ্গির অনেক পরিবর্তন ঘটে। এই যুগের মানুষ সব জিনিসকে যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে তবে গ্রহণ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে বহু যুক্তিবাদী দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটে। বিশেষ করে ফরাসী মনীষীরা এই সময়ে বহু যুক্তিপূর্ণ মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। তাঁদের মতে, সমাজকে অনায়াসেই সুন্দর ও সুখী করা যায়। এজন্য যুক্তি ও বিচার দিয়ে প্রকৃতির নিয়মগুলিকে জানা দরকার। প্রত্যেক লোকেরই জীবিকার অধিকার আছে ; কোন সরকারে জনগণের প্রতিনিধি না থাকলে, সেই সরকার জনগণের উপর কর ধার্য করতে পারে না। তাঁদের এইসব মতবাদ বিভিন্ন দেশে বিপ্লবের পথ তৈরী করতে সাহায্য করেছিল। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীকে বলা হয় যুক্তিবাদের যুগ।

(ক) আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ

আমেরিকা আবিষ্কৃত হবার পরে একে একে স্পেন, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপের শক্তিমান দেশগুলি আমেরিকায় গিয়ে উপনিবেশ গড়ে তুলতে থাকে। কালক্রমে সেখানে ইংরেজরা অন্যান্য জাতিদের চেয়ে বেশী শক্তিমান হয়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলে অনেকগুলি ইংরেজ উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। উপনিবেশগুলিতে পৃথক পৃথক শাসনকার্য চলত। ইংলণ্ড প্রথমদিকে এই সকল উপনিবেশের শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করত না। ফলে ঔপনিবেশিকদের মধ্যে শান্তি ছিল। কিন্তু তার পরে ইংরেজদের হস্তক্ষেপ এবং আরও বিভিন্ন কারণে আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের বিবাদ দেখা দিল।

স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণ :—প্রথমতঃ, বাণিজ্যিক স্বার্থেই ইংরেজরা আমেরিকার উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। পরবর্তীকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ধর্মীয় কারণে তারা আমেরিকায় ব্যাপকভাবে উপনিবেশ গড়ে তুলে। প্রথম প্রথম ইংলণ্ড-সরকারের শাসন ইংরেজ ঔপনিবেশিকগণ স্বজাতি

প্রীতির বশে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের ক্রমাগত কর্তৃত্বের ফলে এক সময়ে তারা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডের সরকার-মনোনীত একজন গভর্ণর এবং তেরোটি উপনিবেশের প্রতিনিধিরা আমেরিকার শাসন চালাতেন। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে আমেরিকানদের কোন প্রতিনিধি ছিল না। তাই তারা স্থির করেছিল—ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে যখন তাদের কোন প্রতিনিধি নেই, তখন সেই পার্লামেণ্টের কথা তারা মেনে চলবে না।

তৃতীয়তঃ, উত্তর আমেরিকার কানাডা অঞ্চলে ফরাসীদের উপনিবেশ ছিল। কানাডা হতে ফরাসীরা ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের উপর আক্রমণ চালাত। এজন্য ঔপনিবেশিকরা ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। ১৭৬৩ সালে ফরাসীরা ইংরেজদের হাতে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হলে কানাডা ইংরেজদের অধিকারে আসে। তখন ঔপনিবেশিকদের মনে ফরাসী ভীতি না থাকায় তারা ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে থাকবার আর কোন প্রয়োজন বোধ করল না।

চতুর্থতঃ, ইংলণ্ডের সরকার আমেরিকায় ক্রমাগত বাণিজ্যিক লুণ্ঠন চালাতে থাকে। ১৭৬৫ সালে ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জর্জ গ্রেনভিল 'স্ট্যাম্প এ্যাক্ট' পাশ করে ঔপনিবেশিকদের ওপর এক নতুন কর বসান। এর ফলে স্ট্যাম্প কিনে সরকারী কাগজে লাগান বাধ্যতামূলক বলে ঘোষিত হয়। ঔপনিবেশিকগণ এই কর দিতে অস্বীকার করে।

পঞ্চমতঃ, ইংলণ্ডের শাসকগণ স্ট্যাম্প কর ছাড়াও ঔপনিবেশিকদের উপর আরও নতুন নতুন করের বোঝা চাপাতে লাগলেন। টাউনসেণ্ড নামে ইংলণ্ডের রাজস্ব মন্ত্রী চিনি, কাঁচ, চা প্রভৃতির উপর শুল্ক কর ধার্য করলে ঔপনিবেশিকগণ তীব্র প্রতিবাদ করল। তাদের প্রতিবাদের ফলে পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসকগণ চা ভিন্ন অন্য সব জিনিসের উপর থেকে কর তুলে নেন। চা-এর উপর কর ধার্য্য থাকায় কয়েকজন ঔপনিবেশিক বোস্টন বন্দরে চা বোঝাই জাহাজে উঠে সব চায়ের বাক্স জলে ফেলে দেয়। এতে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাদের উপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়।

ঔপনিবেশিকদের জব্দ করার জন্য ইংলণ্ড সরকার বোস্টন বন্দর বন্ধ

করে দেন এবং ম্যাসাচুসেটস্ প্রদেশের শায়ত্বশাসনের অধিকার নাকচ করেন। এতে ঔপনিবেশিকরা ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়। ১৭৭৪ খ্রীঃ জর্জিয়া ব্যতীত অপর বারোটি উপনিবেশের প্রতিনিধিরা ফিলাডেলফিয়া শহরে মিলিত হয়ে কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিন্তু ইংলণ্ড সরকার তাঁদের কোন প্রস্তাব গ্রাহ্য করলেন না। ফলে ১৭৭৫ খ্রীঃ ফিলাডেলফিয়ার দ্বিতীয় অধিবেশনে জর্জ ওয়াশিংটন নামে এক বিশিষ্ট ব্যক্তির হাতে স্বাধীনতার যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দিলেন। ইংলণ্ড সরকার ঔপনিবেশিকদের বিদ্রোহ দমন করতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয়। ১৭৭৬ খ্রীঃ ৪ঠা জুলাই ঔপনিবেশিকগণ ফিলাডেলফিয়ার তৃতীয় অধিবেশনে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। ঔপনিবেশিকদের সামরিক উপকরণ এবং যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিল না। সেইজন্য যুদ্ধের সূচনায় তারা বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। কিন্তু পরে জর্জ ওয়াশিংটন-এর নেতৃত্বে ঔপনিবেশিকেরা শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। ১৭৮৩ সালে ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ ভার্সাই নগরীতে এক চুক্তি সম্পাদন করেন এবং আমেরিকার স্বাধীনতার দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন।



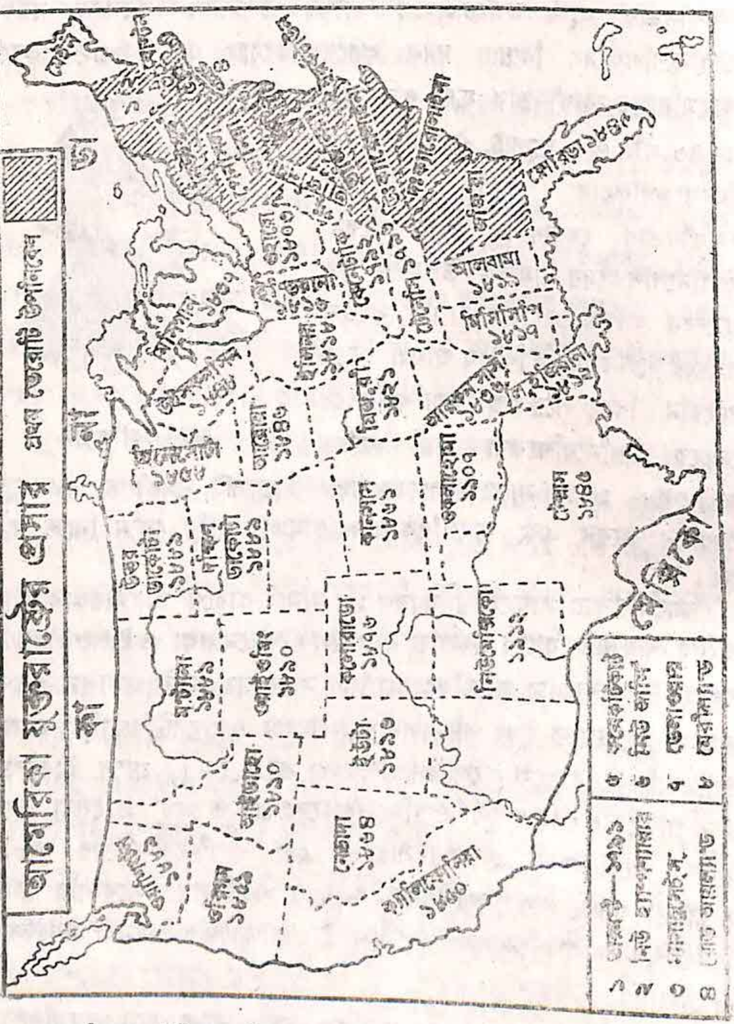
জর্জ ওয়াশিংটন

আমেরিকার সাফল্যের কারণ : নানা কারণে আমেরিকাবাসীগণ তাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মধ্যে দূরত্বের বিরাট ব্যবধান আমেরিকাবাসীদের সাফল্যের একটা অন্যতম কারণ। তাছাড়া ইংরেজদের যুদ্ধ পরিচালনার অব্যবস্থা এবং ত্রুটি বিচ্যুতির ফলেও ঔপনিবেশিকদের পক্ষে যুদ্ধে জয়লাভ করা সহজ হয়। ফ্রান্স ইংলণ্ডের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য ঔপনিবেশিকদের প্রভূত অর্থ ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিল। ফ্রান্সের সাহায্য এবং ঔপনিবেশিকদের গভীর জাতীয়তাবোধ তাদের যুদ্ধে সাফল্য আনয়ন করছিল। সর্বোপরি জর্জ ওয়াশিংটনের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও রণকৌশলই হল আমেরিকানদের সাফল্যের প্রধান কারণ।

ফলাফল : প্রথমতঃ, যুদ্ধ সমাপ্তির কয়েক বছর পরে আমেরিকার তেরটি উপনিবেশ একত্রিত হয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে। এই নবগঠিত রাষ্ট্রের কোন রাজা ছিল না। জনসাধারণের নির্বাচিত

প্রতিনিধি এই যুক্তরাষ্ট্র শাসন করত। এখনো সেই পদ্ধতিই বর্তমান রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ঔপনিবেশিকদের সাফল্য-লাভের ফলে বৃটিশ সরকার তাঁদের সংকীর্ণ শাসন নীতি ত্যাগ করে উদার শাসন নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন।



তৃতীয়তঃ, ইউরোপীয় দেশ গুলির মধ্যে ফরাসী দেশে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ফল সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করেছিল।

লাফায়েৎ প্রমুখ ফরাসী নেতৃবৃন্দ আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের অংশ গ্রহণ করে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তা ফরাসী জনসাধারণকে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করে তুলতে সাহায্য করেছিল।

চতুর্থতঃ, আমেরিকার স্বাধীনতা লাভের ফলে ইংরেজ জাতির ঔপনিবেশিক শাখার এক বিরাট অংশ ইংলণ্ড হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

পঞ্চমতঃ, আমেরিকার উপনিবেশগুলির স্বাধীনতালাভের ফলে স্পেনের আমেরিকাস্থ উপনিবেশগুলিরও ভবিষ্যতে স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পথ উন্মুক্ত হল।

ষষ্ঠতঃ, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামীরাও আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পাঠ করে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন।

(খ) ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব

শিল্পবিপ্লবের অর্থ : শিল্পবিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসের একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এই বিপ্লব শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন আনয়ন করে। মানুষের শারীরিক শক্তির বদলে যন্ত্র শক্তির সাহায্যে শিল্পোৎপাদন শুরু হয়। যেমন, হাতের তাঁতের পরিবর্তে আসল যন্ত্রের তাঁত, যাতে স্বল্প সময়ে বেশী কাপড় উৎপন্ন হতে লাগল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্পের ক্ষেত্রে এই যে পরিবর্তন বা বিপ্লব ঘটল তারই নাম শিল্পবিপ্লব। অর্থাৎ মানুষের শ্রমের পরিবর্তে যন্ত্রের সাহায্যে সামগ্রী উৎপাদনের নতুন পদ্ধতিকে শিল্প বিপ্লব বলা হয়। দীর্ঘদিনের চেষ্টায় এই বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল। ইংলণ্ডেই প্রথম এই বিপ্লবের সূত্রপাত। পরবর্তীকালে পৃথিবীর অন্যান্যদেশে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

কৃষিবিপ্লব : শিল্পের ন্যায় কৃষির ক্ষেত্রেও এই যুগে বিপ্লবের সূচনা হয়। বীজ বপন প্রভৃতি কাজের জন্য ইংলণ্ডে হস্তচালিত যন্ত্রের প্রচলন হল। বৃষ্টির উপর নির্ভর না করে জলাশয় থেকে জল নিয়ে তা চাষে ব্যবহৃত হতে লাগল। উন্নত ধরণের লাঙল ব্যবহার করে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ-আবাদের কাজ শুরু হল। আগে পর পর দু বছর কোন জমিতে একই ফসলের চাষ করবার পর এক বছরের জন্য জমিটি পতিত

রাখতে হত, নইলে জমিতে সেই ফসলের যথেষ্ট ফলন হত না। ফলে প্রতি বছর ইংলণ্ডের এক তৃতীয়াংশ জমি পতিত থাকত। লর্ড টাউনসেণ্ড নামে এক ব্যক্তি নিজে চাষ করে দেখালেন, পতিত জমিতে শালগম ফসলের চাষ করলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় এবং প্রয়োজনীয় একটি ফসলও পাওয়া যায়। এর ফলে কৃষিপণ্যের ব্যাপক উৎপাদন সম্ভব হল।

আবিষ্কার: যে সব যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে শিল্পবিপ্লব ঘটল, তাদের সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন। বয়ন শিল্পের উপরেই যন্ত্র শিল্পের প্রভাব সর্বপ্রথমে লক্ষ্য করা যায়। হারগ্রীভ্‌স 'স্পিনিং জেনী' নামে একটি যন্ত্রের আবিষ্কার করলেন যার সাহায্যে এক সংগে আট গাছা সুতো কাটা যেত। আর্করাইট, ক্রম্পটন প্রভৃতিদের নতুন যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে সুতো কাটা ও বস্ত্র বুনবার ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটল। বয়ন শিল্পের চরম উন্নতি হয় ১৭৬৯ সালে জেমস্ ওয়াট কর্তৃক বাষ্প যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে। খনি থেকে কয়লা তুলবার সময় যাতে কোন দুর্ঘটনা না ঘটে সেইজন্য হামফ্রিডেভি আবিষ্কার করলেন 'সেফ্‌টি ল্যাম্প্'। জর্জ স্টিফেনসন রেলওয়ে ইঞ্জিন আবিষ্কার করলে যাতায়াত ও মাল-বহনের ক্ষেত্রে যুগান্তর সৃষ্টি হল। তাছাড়া কৃষি ও পশু পালনের রীতিতেও বিপ্লব ঘটল। এইভাবে শিল্প বিপ্লবের ফলে মানবজাতি সভ্যতার পথে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল।



জেমস্ ওয়াট

ফলাফল: যে সব আবিষ্কারের কথা বলা হল তাতে মানুষের প্রয়োজনীয় নানা রকম জিনিসপত্র উৎপাদন-প্রণালীর ও ব্যবসা বাণিজ্যের অভাবনীয় পরিবর্তন হয়েছিল। এই বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডবাসীরা অন্য দেশে তাদের শিল্পজাত জিনিসপত্র বিক্রী করে প্রচুর ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করেছিল। দেশের সর্বত্র বড় বড় কারখানা গড়ে উঠেছিল এবং সেখানে হাজার হাজার শ্রমিক নিযুক্ত হয়েছিল। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের ফল কেবল যে ভালই হয়েছে তা নয়, এর ফলে ইংলণ্ডের কুটির শিল্পগুলি নষ্ট হয়ে

যায়। তখন জীবিকা অর্জনের জন্য বেকার গ্রামবাসীরা বড় বড় শিল্প-প্রধান শহরে এসে ভীড় করতে থাকে। এই সময়ের শহরগুলি কোন পরিকল্পনা-প্রসূত ছিল না। শহরের যে কোন স্থানে কারখানা গড়ে উঠত। আর তাকে ঘিরে শ্রমিকদের থাকবার জন্য সুবিধামত যেখানে সেখানে ঘর বাড়ী তৈরী হত। সেগুলি ছিল যেমন নোংরা, তেমনি আলো-বাতাসহীন ও অস্বাস্থ্যকর। আর সেই পরিবেশে হাজার হাজার শ্রমিক কষ্টে দিন কাটাতে বাধ্য হত। ফলে তাদের স্বাস্থ্য, রুচি সবই ধ্বংস হয়ে যেতে থাকে। এদিকে কারখানার মালিকেরা কেবল লাভের দিকে নজর রাখতেন ও উৎপাদনের খরচ যত কমান যায়, তার চেষ্টা করতেন। ফলে এই সময়ে শ্রমিকদের দুর্দশার সীমা ছিল না। পুরুষ, নারী এমন কি বালক-বালিকাদেরও দিনে চৌদ্দ কিংবা ষোল ঘণ্টা খাটতে হত। তাদের চাকুরীও কোন রকম স্থায়ী ছিল না। অল্প মজুরিতে কাজ করান যায় বলে কারখানাগুলিতে বহু শিশু শ্রমিক নিয়োগ করা হত। উৎপীড়িত শ্রমিকেরা ক্রমশঃ কারখানার মালিকদের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। ফলে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। শিল্পবিপ্লবের কুফল যতই থাকুক না কেন, একথা মনে রাখা দরকার যে প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে মানুষ অশেষ সম্পদের অধিকারী হয়েছে।

(গ) *ফরাসী বিপ্লব*

প্রাক বিপ্লব অবস্থা : অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশে শোষণ ও বৈষম্য পুরোদমে বজায় ছিল। রাজারা ছিলেন চরম স্বেচ্ছাচারী। যাজক ও অভিজাত শ্রেণী সুখ ও ঐশ্বর্যের মধ্যে দিন কাটাত। সাধারণ লোকের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসীদের যুক্তিবাদের ব্যাপক প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। এই যুক্তিবাদী চিন্তাধারা বিপ্লবের পূর্বেই ফরাসী জনগণের মানসিক পরিবর্তন আনে। এ সময়ে ফরাসী দেশে ভলতেয়ার, মণ্টেস্কু, রুশো প্রভৃতি চিন্তানায়কদের আবির্ভাব হয়। তাঁরা সমাজের সর্বপ্রকার অন্যায়, শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ

জানাতে থাকেন। নিপীড়িত ফরাসী জনগণের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এই সকল চিন্তানায়কদের রচনায় প্রকাশ হতে থাকে এবং সমগ্র দেশে জনজাগরণ দেখা দেয়।

ভলতেয়ার : ইনি ছিলেন একজন বিখ্যাত দার্শনিক ও লেখক। তাঁর লেখা দেশে বিপ্লবের মনোভাব জাগিয়ে তুলেছিল। তিনি সমাজের সমস্ত অবিচার ও মূর্খতার বিরুদ্ধে বিদ্রূপ করে কবিতা ও নাটক রচনা করতেন। ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের রচনাতেও তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। তিনি তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে যাজকদের দুর্নীতি ও অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থপরতার সমালোচনা করেছিলেন। তিনি প্রচলিত কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর না করে সকলকে যুক্তিবাদী হতে পরামর্শ দেন।

মন্টেস্কু : এই ফরাসী দার্শনিক 'দি স্পিরিট অব দি লজ' এবং 'পার্সিয়ানা লেটার্স' নামে দুইটি গ্রন্থ রচনা করেন। শেষের গ্রন্থে রাজ পরিবার ও রাজসভা কিরূপে দুর্নীতির পাঁকে ডুবে আছে তা তিনি দেখিয়েছিলেন। 'দি স্পিরিট অব দি লজ' গ্রন্থে তিনি ফ্রান্সের স্বৈরাচারী শাসন ও স্বর্গীয় অধিকার নীতির সমালোচনা করেন। মন্টেস্কু আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগকে পৃথক করার পরামর্শ দেন।

রুশো : এই যুগের একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল লেখক। তিনি ছিলেন গণতন্ত্রের সমর্থক। তিনি তাঁর 'কনট্রাক্ট স্যোশিয়েল' (সামাজিক চুক্তি) গ্রন্থে জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর মতে, জনসাধারণ ও রাজার মধ্যে এক চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। জনগণ রাষ্ট্রের শাসন-ভার রাজার উপর ছেড়ে দেয়। সেজন্য রাজার কর্তব্য জনগণের মতামত নিয়ে রাষ্ট্রের শাসন কার্য পরিচালনা করা। রাজা যদি নিজ কর্তব্য পালন না করেন তবে তাঁকে অপসারিত করার অধিকার জনগণের আছে। রুশোর এই লেখা পড়ে ফ্রান্সের জনগণের মনে বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল।



রুশো

ফরাসী বিপ্লবের কারণ : ফরাসী বিপ্লব কোন একটি বিশেষ কারণে সংগঠিত হয়নি। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক চিন্তাবিদদের প্রভাব ও অন্যান্য নানা কারণে এই বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছিল।

রাজনৈতিক কারণ : প্রাক-বিপ্লব যুগে ফ্রান্সে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই রাজতন্ত্র-অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দুর্বল হয়ে পড়ে। চতুর্দশ লুই-এর আমলে রাজতন্ত্রের দুর্বলতা চোখে না পড়লেও পঞ্চদশ ও ষোড়শ লুই-এর আমলে তা সুস্পষ্ট হ'য়ে দেখা দেয়। সুযোগ বুঝে অভিজাত শ্রেণী ক্ষমতার অপব্যবহার করতে থাকে। বিচারের নামে চলতে থাকে প্রহসন। একদিকে চতুর্দশ লুই-এর যুদ্ধের ব্যয় দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দুর্বল করে দেয় অপর দিকে তেমনি পঞ্চদশ ও ষোড়শ লুই-এর আড়ম্বর প্রিয়তা ও অমিতব্যয়িতা কোষাগারকে প্রায় শূন্য করে ফেলে। শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেই নয়, পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ও ফ্রান্সের সম্মান বিনষ্ট হ'য়ে পড়ে। এক কথায় ফরাসী রাজতন্ত্রের ব্যর্থতার জন্যই জনসাধারণ রাজতন্ত্রের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে।

সামাজিক কারণ : ফরাসী সমাজ সাধারণতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, যথা—যাজক শ্রেণী, অভিজাত এবং সাধারণ লোক। যাজক শ্রেণী ছিল সমাজের প্রথম সম্প্রদায়, অভিজাত শ্রেণী ছিল দ্বিতীয় সম্প্রদায় এবং বাকী সাধারণ লোকেরা ছিল তৃতীয় সম্প্রদায় ভুক্ত। প্রথম দু-শ্রেণী সামাজিক মর্যাদা পেতে, বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। সুখ ও বিলাসের মধ্যে দিন কাটানো ছিল তাঁদের কাজ। কিন্তু তৃতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও শিক্ষিত হওয়া সত্বেও কোন সামাজিক সম্মান ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করত না। দেশের শাসন কার্যে তাদের কোন অধিকার ছিল না। ফলে তৃতীয় সম্প্রদায় তাদের শোচনীয় অবস্থা হতে মুক্তিলাভ করার জন্য এবং দারিদ্রমোচনের আশায় বিপ্লবের পথে অগ্রসর হল।

অর্থনৈতিক কারণ : ফ্রান্সে যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় যে বিশেষ সুবিধাগুলি ভোগ করত তার মধ্যে অর্থনৈতিক সুবিধা অন্যতম। এই দুই সম্প্রদায়কে কোন কর দিতে হত না। দেশের প্রায় সমগ্র করভার বহন

করত তৃতীয় সম্প্রদায়ের লোকের অর্থাৎ মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রমিক ও কৃষকেরা। মোট আদায়ীকৃত করের শতকরা ৯৬ ভাগ তারাই বহন করত। ফলে তাদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। করভারে জর্জরিত ও আর্থিক দুর্দশায় বিপন্ন তৃতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ এই অসহনীয় অবস্থার পরিবর্তনের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল।

উপরোক্ত কারণগুলির জন্য ফরাসী জনগণের মনে যে বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল তা আরও প্রকট হয়ে উঠল ভলতেয়ার, মণ্টেস্কু, রুশো প্রভৃতি দার্শনিকদের বৈপ্লবিক রচনায়। তাঁদের রচনা পড়ে ফরাসী জনগণ প্রচলিত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার উপর আস্থা হারাল। সেই সময় ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুই অর্থ-সংগ্রহের তাগিদে বাধ্য হয়ে স্টেটস্ জেনারেল আহ্বান করলে স্বভাবতই বিপ্লবের সূত্রপাত হল।

বিপ্লবের প্রসার : দীর্ঘ পৌনে দুশ বছর স্টেটস্ জেনারেল ডাকা হয় নি। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের মতই এর মর্যাদা ছিল। স্টেটস্ জেনারেলে অভিজাত ও যাজক শ্রেণীরাই সব সুযোগ পেতেন। কিন্তু সাধারণ শ্রেণীর প্রতিনিধিদের সামান্যতম গুরুত্ব দেওয়া হত না। এই অবস্থায় সাধারণ শ্রেণীর প্রতিনিধিরা একদিন এক সভায় সমবেত হয়ে বিভিন্ন প্রকার দাবী উত্থাপন করতে লাগলেন। রাজা তাঁদের দাবী মানতে রাজী না হলে তাঁরা সেই সভাকে ফরাসীর জাতীয় সভা বলে ঘোষণা করলেন এবং দেশের দুরবস্থা দূর করার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলেন। তাঁদের কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট হয়ে রাজা সভার অধিবেশন বন্ধ করে দিলেন। সাধারণ শ্রেণীর প্রতিনিধিবর্গ তখন সভার নিকটবর্তী একটি টেনিস খেলার মাঠে সমবেত হয়ে শপথ গ্রহণ করলেন যে, যতদিন পর্যন্ত তাঁরা দেশের জন্য একটি শাসনতন্ত্র তৈরী করতে না পারবেন ততদিন তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে যাবেন। তাঁদের এই শপথ 'টেনিস মাঠের শপথ' নামে খ্যাত।

জাতীয় পরিষদ যখন নতুন সংবিধান তৈরীর কাজে ব্যস্ত ; সেই সময় ফরাসী দেশের শোষিত মানুষ সশস্ত্র বিপ্লবের পথে পা বাড়ালো। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা হল তাদের মূল মন্ত্র। রাজপ্রাসাদ, জমিদারের

শস্যভাণ্ডার, কারাগার সব কিছু তাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে ফরাসী দেশের বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে পড়ল। বিপ্লবীরা শোষণ ও লাঞ্ছনার প্রতীক বাস্তিল দুর্গ দখল (১৭৮৯ খ্রীঃ ১৪ই জুলাই) করে সেখানকার বন্দীদের মুক্তি দিল। এর পাশাপাশি চলতে লাগল এক বিশৃঙ্খল অরাজক অবস্থা। এই সমস্ত বিপ্লবাত্মক ঘটনার ফলে দেশে যে পরিস্থিতি দেখা দিল তাতে বেকারত্ব ও দারিদ্র ক্রমশঃই বেড়ে চলল। প্যারিসে চরম খাদ্যাভাব দেখা দিলে সেখানকার কয়েক হাজার স্ত্রীলোক একদিন ভয়ংকরী মূর্তিতে কামান সহ রাজার উদ্দেশ্যে ভার্সাই নগরীর দিকে অগ্রসর হল। রাজা লুই তাদের হাতে একপ্রকার বন্দী অবস্থায় প্যারিসে আসতে বাধ্য হলেন। জাতীয় সভাও তখন প্যারিসে স্থানান্তরিত হল।

এই জাতীয়সভা দেশের জন্য এক নতুন শাসনতন্ত্র রচনা করেন। তাতে স্থির হয় যে, রাজা আইন অনুসারে দেশ শাসন করবেন, আইন সভার মত ভিন্ন কোন যুদ্ধ বা শান্তি ঘোষণা করতে পারবেন না ইত্যাদি। রাজা বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত এই শাসনতন্ত্র মেনে নেন। কিন্তু একদিন ষোড়শ লুই ও রাণী আঁতোয়ানাত স্বদেশ হতে পলায়নের চেষ্টা করে ধরা পড়েন। এই ঘটনায় রাজা ও রাণীর উপরে জনসাধারণের বিরূপ মনোভাব আরও বৃদ্ধি পেল।

রাজা ষোড়শ লুইয়ের রাণী আঁতোয়ানাত ছিলেন অষ্ট্রিয়ার রাজকুমারী। তিনি বিপ্লবীদের উচ্ছেদ সাধনের জন্য অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের সঙ্গে গোপনে পরিকল্পনা করলেন। রাজা ষোড়শ লুইয়ের পক্ষ নিয়ে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া একযোগে আক্রমণ চালাল। জাতীয় সভা দেশের এই বিপজ্জনক অবস্থার জন্য রাজাকেই দোষী সাব্যস্ত করল এবং একটি বিশেষ আদালতে তার বিচার চলল। শেষ পর্যন্ত তাঁকে 'গিলোটিন' নামক এক ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে হত্যা করা হল। পূর্বেই যে নতুন সংবিধান চালু হয়েছিল, এইবার তার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠল নতুন প্রজাতান্ত্রিক শাসন।

২। **বিপ্লবের একজন সৈনিক এবং সম্রাট হিসাবে নেপোলিয়ন—ইউরোপের বিদ্রোহ :** অত্যাচারী রাজা ষোড়শ লুইয়ের নিষ্ঠুর হত্যার পরেও

দেশে শান্তি আসেনি। নতুন প্রজাতান্ত্রিক শাসন শুরু হবার পরে আরম্ভ হয় ক্ষমতা দখলের জন্য রেষারেষি। বিপ্লবীরা বিভিন্ন দল আর উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। ফলে দেশে চরম সন্ত্রাস আর অরাজকতা নেমে আসে। হাজার হাজার নর-নারীকে গিলোটিন নামক অস্ত্রে প্রাণ হারাতে হল। বিপ্লবী নেতা রবস্‌পিয়র দেশে দারুণ ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজ দোষে জাতীয় সভার বিচারে গিলোটিনে প্রাণ হারালেন। তাঁর মৃত্যুর পর মধ্যপন্থী নেতৃবর্গ ফ্রান্সের জন্য একটি নতুন গঠনতন্ত্র রচনা করেন। দেশ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হল পাঁচজন সদস্য বিশিষ্ট 'ডাইরেক্টরী' নামে এক পরিষদের ওপর। এই ডাইরেক্টরীর শাসনকালেই নেপোলিয়ন নামে এক বীর সৈনিক ফরাসীর গৌরব বৃদ্ধি করেন। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইউরোপে যে শক্তিসংঘ গঠিত হয়েছিল নেপোলিয়ন তা থেকে ফ্রান্সকে রক্ষা করেন। তিনি টুলোঁ বন্দরটিকে ইংরেজ নৌ-বাহিনীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করেন। তিনি ইটালীর সার্ডিনিয়া দ্বীপটি দখল করেন এবং অষ্ট্রিয়াকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। তিনি ভেনিস দখল করতেও সমর্থ হন। অষ্ট্রিয়াও তাঁর নিকট পরাজিত হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। এইভাবে বিভিন্ন কৃতিত্বের মাধ্যমে নেপোলিয়ন জনসমর্থন লাভ করেন।

পরবর্তীকালে ডাইরেক্টরীর কর্মপন্থায় দেশের মধ্যে এক বিশৃংখলা দেখা দিলে ফরাসী জনগণের পূর্ণ সমর্থনে তিনি ডাইরেক্টরীর পতন ঘটিয়ে দেশের প্রথম 'কনসাল' নিযুক্ত হন এবং শাসন বিষয়ে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। তিনি সাধারণতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করেন। নেপোলিয়নের চেষ্টায় বৈদেশিক যুদ্ধে ফ্রান্স জয় লাভ করে। এই জয়লাভের ফলে নেপোলিয়নের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় এবং তিনি ফ্রান্সের 'সম্রাট' এই উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনে এক শক্তিশালী স্থায়ী সরকার গঠিত হয়।

সম্রাট হিসাবে নেপোলিয়ন : নেপোলিয়ন নিজ কৃতিত্বে রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ড ব্যতীত ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশকে পরাজিত করেন এবং ঐ দেশগুলির উপর দীর্ঘদিন ধরে কর্তৃত্ব করেন। শুধু যুদ্ধ জয়ই নয় সম্রাট হিসাবে নেপোলিয়ন আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও নানা প্রকার সংস্কার করেছিলেন। 'নেপোলিয়ন আইনবিধি' (নেপোলিয়ন কোড) হল তার

সংস্কারগুলির অন্যতম। এই আইন বিধিতে আইনের চক্ষে সকলকে সমান বলে ঘোষণা করা হয়। ইউরোপের মধ্যে তিনিই প্রথম সকলের ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ সমান করেন। এছাড়া নেপোলিয়ন 'ব্যাংক অব্ ফ্রান্স' নামে এক জাতীয় ব্যাংক স্থাপন করেন এবং ঐ ব্যাংক থেকে ব্যবসায়ীগণ যাতে অর্থ সাহায্য পায় তার ব্যবস্থা করেন। তিনি ধর্মের ব্যাপারেও উদার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। এজন্য তিনি ১৮০১ খ্রীঃ পোপের সঙ্গে ধর্ম-সম্পর্কে এক আপোষ-মীমাংসায় উপনীত হন। ইহাই '১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ধর্মমীমাংসা' (কনকরডেট অব ১৮০১) নামে খ্যাত। এছাড়া জাতীয় শিক্ষা উন্নয়ন, রাস্তাঘাটের উন্নতিসাধন, বেকার সমস্যা দূরীকরণ, মিউজিয়াম স্থাপন প্রভৃতি ছিল তাঁর কীর্তি সমূহের অন্যতম।



নেপোলিয়ান

ইউরোপে নেপোলিয়নের বিরোধিতা ঃ নেপোলিয়ন স্বীয় সমর প্রতিভার বলে প্রায় সমগ্র ইউরোপকে পদানত করেছিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডকে পদানত করতে পারেন নি। তাই নেপোলিয়ন চিন্তা করলেন যে ইংলণ্ডের বৈদেশিক বাণিজ্য ধ্বংস করলে ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক শক্তি বিনষ্ট হয়ে পড়বে এবং তখনই ইংলণ্ড তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক আদেশ বলে ইউরোপের কোন দেশে ইংলণ্ডের কোন শিল্পদ্রব্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ করলেন। এই ব্যবস্থা 'কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম' নামে পরিচিত। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে নেপোলিয়ন ইংরেজ জাতিকে হাতে মারতে না পেরে ভাতে মারতে চাইলেন। এদিকে ইংলণ্ডও এই ব্যবস্থার প্রত্যুত্তরে 'অর্ডার্স-ইন-কাউন্সিল' জারি করে ফ্রান্সের অধীন কোন রাজ্যের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য নিষিদ্ধ করল। ফলে ইংলণ্ড থেকে বাণিজ্য সামগ্রী

আমদানী করতে না পারায় ইউরোপের দেশগুলি ভীষণ অসুবিধায় পড়ল। অনেকেই এজন্য নেপোলিয়নের উপর বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হলেন।

এদিকে 'কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম' কার্যকরী করা নিয়ে নেপোলিয়নের সঙ্গে রাশিয়ার সম্রাট আলেকজাণ্ডারের বিরোধ বাধে। ইংলণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করার যে নির্দেশ নেপোলিয়ন দেন তা তিনি উপেক্ষা করেন। ফলে তাঁকে শাস্তি দেওয়ার জন্য নেপোলিয়ন সসৈন্যে মস্কো অভিযান করলেন। রাশিয়ার প্রচণ্ড শীতে, খাদ্যাভাবে এবং রুশ জনগণের বিরোধিতায় নেপোলিয়ন মস্কো ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। এতে নেপোলিয়নের সামরিক খ্যাতি নষ্ট হ'ল।

স্পেন অধিকার করবার পর নেপোলিয়ন কৌশলে তাঁর ভ্রাতা জোসেফকে স্পেনের সিংহাসনে বসালে স্পেনবাসী খুব মর্মাহত হয়। তারা দেশে এক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলে। অত্যাচার ও প্রাণদণ্ডের ভয় সত্ত্বেও আন্দোলনকারীরা নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়ে সাফল্য অর্জন করতে লাগল। স্পেনবাসী সাহায্য প্রার্থনা করলে ইংলণ্ড তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। ফলে ইংলণ্ডের সঙ্গে ফরাসীদের যুদ্ধ বাধে। প্রাশিয়াও সুযোগ বুঝে রাশিয়ার সাহায্যে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। অষ্ট্রিয়াও প্রাশিয়ার সঙ্গে যোগ দেয়। ফলে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে 'লিপজিগ-এর যুদ্ধে ইউরোপীয় সম্মিলিত বাহিনীর কাছে নেপোলিয়ন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। ইতিমধ্যে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইউরোপের চারটি বৃহৎ শক্তি যথা— ইংলণ্ড, রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়া 'চতুর্থ শক্তিসংঘ' গঠন করে। তাদের সম্মিলিত বাহিনী ফ্রান্স আক্রমণ করলে নেপোলিয়ন পরাজিত হলেন সিংহাসন ছেড়ে তখন তাঁকে এলবা দ্বীপে আশ্রয় নিতে হল। কিছুদিনের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করে আবার তিনি প্যারিসে ফিরে আসেন। কিন্তু পরপর দুটি যুদ্ধে জয়লাভ করলেও ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ওয়াটারলু' নামক যুদ্ধে তিনি ইংরেজ সেনাপতি ডিউক-অব-ওয়েলিংটনের কাছে দারুণ ভাবে পরাজিত হলেন। এবার তাঁকে সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত করা হল। সেখানেই তিনি মারা যান (১৮২১, ৫ই মে)।

৩। ফরাসী বিপ্লবের স্থায়ী ফলাফল :—ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিপ্লবের মধ্য দিয়েই সেই দেশের জনগণ স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করে এক নতুন নজীর স্থাপন করেছিল। পরবর্তীকালে ইউরোপের ইতিহাসে অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহের মূলে ছিল ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা—বিপ্লবের এই বাণী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করেছিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরও এই বিপ্লব এক নতুন অনুপ্রেরণা দিয়েছিল।

কালক্রম

আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র···৪ঠা জুলাই,	১৭৭৬ খ্রীঃ
আমেরিকার স্বাধীনতা লাভ	১৭৮৩ খ্রীঃ
ফরাসী দেশে নতুন প্রজাতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা	১৭৯২ খ্রীঃ
ওয়াটারলুর যুদ্ধ	১৮১৫ খ্রীঃ

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে ইংরেজ শাসকদের বিবাদের কারণগুলি উল্লেখ কর।

২। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি বিবরণ দাও।

৩। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর।

৪। ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লবের সময়ের বিভিন্ন আবিষ্কারগুলি বর্ণনা কর।

৫। শিল্প বিপ্লবের ফলাফল আলোচনা কর।

৬। ফরাসী বিপ্লবের কারণগুলি উল্লেখ কর।

৭। কিভাবে ফরাসী বিপ্লবের প্রসার ঘটেছিল ?

৮। সৈনিক ও সম্রাট হিসাবে নেপোলিয়নের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। যুক্তিবাদের যুগ বলতে কি বুঝায় ?
২। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে আমেরিকানদের সাফল্যের কারণ কি ?
৩। শিল্প বিপ্লবের অর্থ কি ?
৪। কিভাবে ইংলণ্ডের কৃষি বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল ?
৫। রুশো, ভলতেয়ার ও মন্টেস্কুর মতবাদ কি ছিল ?
৬। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইউরোপের শক্তিবর্গের বিদ্রোহ বর্ণনা কর।
৭। ফরাসী বিপ্লবের স্থায়ী ফলাফল উল্লেখ কর।

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। শূন্য স্থান পূর্ণ কর ঃ
(ক) ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী — ঔপনিবেশিকদের উপর স্ট্যাম্প এ্যাক্ট বসান।
(খ) আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি ছিলেন —।
(গ) সেফটি ল্যাম্প আবিষ্কার করেন —।
(ঘ) বাষ্প যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন —।
(ঙ) হারগ্রীভসের উদ্ভাবিত যন্ত্রের নাম —।
(চ) 'পার্শিয়ার পত্রাবলী' রচনা করেছিলেন —।
(ছ) বিপ্লবের সময়ে ফরাসীদেশের রাজা ছিলেন —।
(জ) নেপোলিয়ন — খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সম্রাট পদ লাভ করেন।
(ঝ) ইংরেজ সেনাপতি — ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়নকে পরাজিত করেন।
(ঞ) — সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়।

নবম অধ্যায়

॥ ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ইউরোপের ইতিহাস ॥

(ক) জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র বনাম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ঃ নেপোলিয়নের পতনের পর বিজয়ী মিত্রশক্তিবর্গ ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা শহরে এক সম্মেলনে মিলিত হন। এই সম্মেলনে গৃহীত ব্যবস্থা 'ভিয়েনা চুক্তি' নামে খ্যাত। সম্মেলনে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার, প্রাশিয়ার রাজা তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়ম, ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাসলরীগ, ফরাসী প্রতিনিধি ট্যালিরাণ্ড এবং অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটারনিক ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভিয়েনা সম্মেলনের পূর্বে ইউরোপে শান্তি বজায় রাখার জন্য গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি বড় বড় আদর্শের কথা ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু সবই ছিল ফাঁকা আওয়াজ। কার্যক্ষেত্রে রাজতন্ত্র ও স্বেচ্ছাচারে বিশ্বাসী সম্মেলনের কর্ণধারগণ ফরাসী বিপ্লব হতে উদ্ভূত জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন। তাঁদের নিজ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য শেষ পর্যন্ত সেই পুরানো নীতিই অবলম্বিত হল। ভিয়েনা সম্মেলনের নীতিগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—(১) রাষ্ট্র সমূহের পুনর্বণ্টন ও ক্ষতিপূরণ, (২) ন্যায্য অধিকার ও (৩) শক্তিসাম্য নীতি।

(১) রাষ্ট্রসমূহের পুনর্বণ্টন ও ক্ষতিপূরণ ঃ নেপোলিয়নের পতনের পর মিত্রশক্তিসমূহ ইউরোপের পুনর্বণ্টনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। তাছাড়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বহু রাষ্ট্রের ক্ষতি হওয়াতে ক্ষতি পূরণের প্রশ্নও বিবেচিত হল। এর ফলে রাশিয়া পেল গ্র্যাণ্ড ডাচি অব ওয়ারস-এর অধিকাংশ অঞ্চল, ফিনল্যাণ্ড ও বেসারেবিয়া অঞ্চল। অস্ট্রিয়া পেল পোল্যাণ্ডের কিয়দংশ, ইলিরিয়া অঞ্চল, উত্তর ইটালীর লোম্বার্ডি ও ভেনিসিয়া অঞ্চল। বেলজিয়ামকে হল্যাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হল। প্রাশিয়া পেল স্যাক্সনির কতকাংশ, পশ্চিম পোমেরানিয়া অঞ্চল এবং রাইন নদীর উভয় তীরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। পুরস্কার স্বরূপ ইংলণ্ডকে দেওয়া হল হেলিগোল্যাণ্ড, মাল্টা, আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, ত্রিনিদাদ, উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদেশ ও সিংহল। শাস্তিস্বরূপ নরওয়েকে ডেনমার্ক সাম্রাজ্য

সংহতিও বিনষ্ট হল। আসলে এই পুরস্কার হল 'বিজেতার পুরস্কার ও বিজিতের শাস্তি'।

(২) ন্যায্য অধিকার : এই নীতি অনুসারে ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত রাজবংশগুলি নিজ নিজ দেশের শাসন পরিচালনাতে পুনরায় অধিকারী হল। তাই ফ্রান্সে, স্পেনে ও ন্যাপল্‌সে বুঁর্বো পরিবারকে হল্যাণ্ডে অরেঞ্জ রাজবংশকে এবং পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়ায় স্যাভয় পরিবারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হল।

(৩) শক্তিসাম্য নীতি : ভিয়েনা সম্মেলনের আসল উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের শক্তি খর্ব করা এবং ইউরোপের কোন রাষ্ট্র যাতে অত্যাধিক ক্ষমতাশালী হয়ে অন্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিপন্ন করতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। তাই ফ্রান্সকে ফিরে যেতে হল বিপ্লবের পূর্বের সীমারেখায়। ফ্রান্সের চারপাশের রাষ্ট্রগুলিকে শক্তিবৃদ্ধি করে তার উপর দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা হল।

এইভাবে ভিয়েনা চুক্তির মাধ্যমে সম্মেলনের কর্ণধারগণ জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রকে উপেক্ষা করে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ফরাসী বিপ্লবের পূর্বতন অবস্থা পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা পরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করে নীচ স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়েছিলেন। জনগণের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিবিদদের স্বার্থপর নীতির কাছে কোন স্থান পেল না। ভিয়েনা সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিক্রিয়াশীল কর্ণধারগণের মধ্যে অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটারনিকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মেটারনিকের কার্যাবলী : মেটারনিক ছিলেন ভিয়েনা সম্মেলনের সভাপতি ও প্রকৃত পরিচালক। ইউরোপের ইতিহাসে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে 'মেটারনিকের যুগ' বলা হয়ে থাকে। বলিষ্ঠ চরিত্র, অসাধারণ কূটনীতিজ্ঞান, মানচিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা প্রভৃতি গুণের জন্য তিনি সহজেই উপস্থিত প্রতিনিধি মণ্ডলীর উপর তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। মেটারনিক ছিলেন গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের বিরোধী। তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের জন্য তাঁকে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

মেটারনিক মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন যাতে অস্ট্রিয়াতে কোনদিন গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। তাই তিনি ভিয়েনা সম্মেলনের মাধ্যমে সারা ইউরোপেই এই ব্যবস্থা কার্যকরী করলেন।

এই সময়ে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা ছিল স্বৈরতান্ত্রিক এবং সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা ছিল বহু জাতিতে বিভক্ত। মেটারনিক বুঝেছিলেন, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করলে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য টিকবে না। তাই তিনি স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নীতি অবলম্বন করেছিলেন। তিনি নিজ সাম্রাজ্যে মুক্তিসংগ্রামীদের কারারুদ্ধ করলেন এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। তাছাড়া তিনি সংবাদপত্রের বিধি নিষেধ আরোপ করেন এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় যাজক শ্রেণীর প্রভাব বৃদ্ধি করেন।

এইভাবে মেটারনিকের কুটকৌশল ইউরোপের বিপ্লব-প্রসূত গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হল এবং প্রতিক্রিয়াশীল রাজবংশের স্বার্থ অগ্রাধিকার পেল।

চতুঃশক্তি মিতালী : ভিয়েনা সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ কার্যকর করার জন্য ইউরোপের প্রধান শক্তিবর্গ একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করল। ইতিপূর্বে জার আলেকজাণ্ডারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'পবিত্র মৈত্র' ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এইবার চরম প্রতিক্রিয়াশীল মেটারনিকের উদ্যোগে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে 'চতুঃশক্তি মিতালি' স্থাপিত হল রাশিয়া, প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও ইংলণ্ড এই চারটি শক্তি নিয়ে। চতুঃশক্তি মিতালির উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা ছিল খুব স্পষ্ট। ফরাসী বিপ্লবের ন্যায় কোন বৈপ্লবিক উত্থান যাতে ইউরোপে না হয় সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা, প্রাক-বিপ্লব যুগের অবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের আধিপত্য গড়ে তোলাই ছিল চতুঃশক্তি মিতালির প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু বিপ্লব-প্রসূত গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদকে দমন করা গেল না। পারস্পরিক অবিশ্বাসের ফলে শেষ পর্যন্ত এই মৈত্রী চুক্তিও ব্যর্থ হল।

(খ) ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপে (ইটালী ও জার্মানিতে) জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্রের বিকাশ : ফরাসী বিপ্লবের সময়ে বিপ্লবীরা

পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র স্বাধীনতা, সামাজিক সমতা ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করেছিল। তাই ইউরোপের পরাধীন জাতিগুলির মধ্যে স্বাধীনতাস্পৃহা এবং স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুলবার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে ইটালী ও জার্মানীতে আমরা যে স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপনের চেষ্টা দেখতে পাই তার মূলেও ছিল ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব।

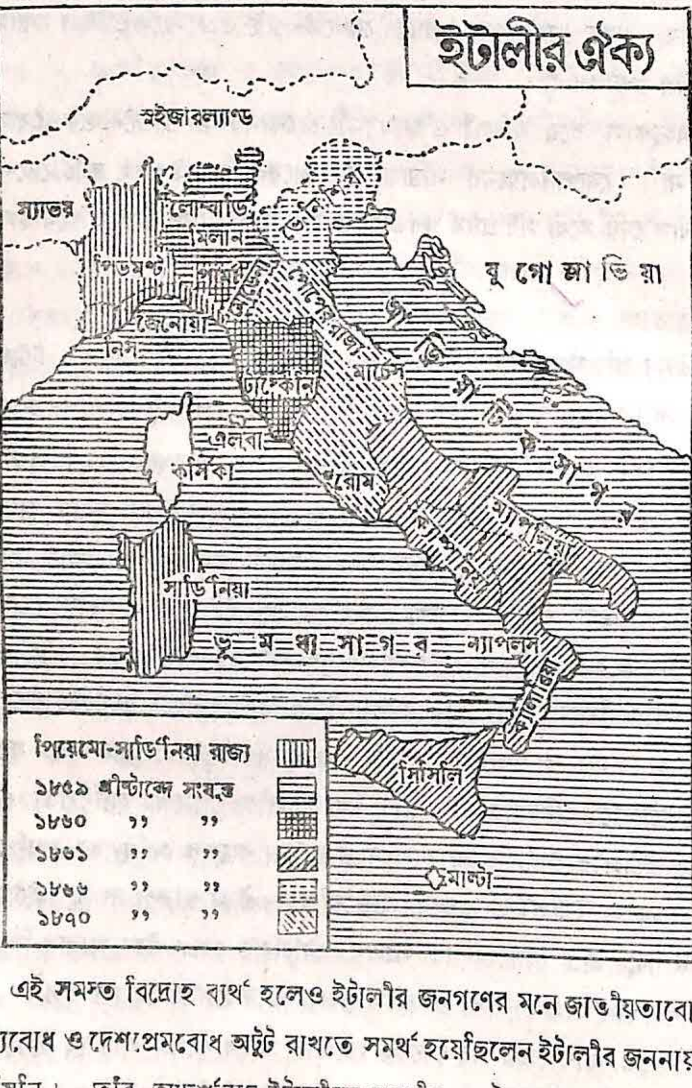
বহুকাল ধরে ইটালী ও জার্মানীতে কোনরকম রাজনৈতিক একতা ছিল না। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলেই এই দুটি দেশের অধিবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয়েছিল।

ইটালী

ঐক্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে ইটালী ঃ ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে ইটালী অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। এই রাষ্ট্রগুলির শাসকবর্গের অযোগ্যতা ও অত্যাচারের ফলে ইটালীয়দের দুঃখের সীমা ছিল না। কিন্তু যখন সার্ডিনিয়া ও সিসিল দ্বীপ ব্যতীত ইটালীর প্রায় সমস্ত অংশই নেপোলিয়নের অধিকারে আসে তখন সম্রাট নেপোলিয়ন প্রায় সমগ্র ইটালীকে এক শাসন ব্যবস্থার অধীনে এনে ইটালীতে জাতীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু নেপোলিয়নের পতনের পর ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপীয় মিত্রবর্গ অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় মিলিত হয়ে ইউরোপের রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থার পুনর্গঠন করেন। ভিয়েনা ব্যবস্থার ফলে উত্তর ইটালীতে অষ্ট্রিয়ার আধিপত্য, মধ্য ইটালীতে পোপের আধিপত্য এবং দক্ষিণ ইটালীর সিসিলি ও ন্যাপলসে বুর্বোঁ বংশের আধিপত্য স্থাপিত হল। ফলে ইটালীতে কোন রাজনৈতিক ঐক্য থাকল না এবং ইটালী নামটি শুধুমাত্র ভৌগোলিক সজ্ঞায় পর্যবসিত হল। ইহা আবার বিভক্ত হয়ে পরাধীন ও অত্যাচারী প্রতিক্রিয়াশীল শাসকবর্গের পদানত হল।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকেই ইটালীর অধিবাসীগণ গণতন্ত্র, ঐক্য ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করে। ইটালীর বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে। এই সব গুপ্ত সমিতির মধ্যে 'কারবোনারী' ছিল

খুবই উল্লেখযোগ্য। গোপন ষড়যন্ত্র ও প্রকাশ্য বিদ্রোহের মাধ্যমে কারবোনারীর সভ্যগণ ইটালীতে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন তাঁরা ন্যাপলসে বিদ্রোহী হলে ন্যাপলসের রাজা দ্বিতীয় ফার্ডিন্যাণ্ড অষ্ট্রিয়ার সামরিক সাহায্যে ইটালীর স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ করে দেন।



এই সমস্ত বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও ইটালীর জনগণের মনে জাতীয়তাবোধ, ঐক্যবোধ ও দেশপ্রেমবোধ অটুট রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন ইটালীর জননায়ক ম্যাৎসিনি। তাঁর আদর্শবাদ ইটালীকে স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

মাৎসিনী : জেনোয়ার এক সঙ্গতি-সম্পন্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে যোসেপ মাৎসিনীর জন্ম হয়। তরুণ বয়সেই মাৎসিনী দেশের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। অস্ট্রিয়া ও অস্ট্রিয়ার অনুগত ইটালীর শাসকবর্গের প্রতি তাঁর ঘৃণার অন্ত ছিল না। প্রথম জীবনে মাৎসিনী "কারবোনারী" নামক গুপ্ত সমিতির সভ্য হন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "তরুণ ইটালী" নামক এক গুপ্ত সমিতি গঠন করেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল ইটালীকে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা। তবে ইটালীর স্বাধীনতা যুদ্ধে কোন বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ না



মাৎসিনী

করাই ছিল মাৎসিনীর নীতি। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবে মাৎসিনীর অনুচরবর্গ অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। বিপ্লবীগণ পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার অধিপতি চার্লস অ্যালবার্টকে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে আহ্বান জানায়। চার্লস অ্যালবার্ট অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে, পরাজিত হন। এদিকে বিপ্লবীগণ রোমে আন্দোলন শুরু করলে পোপ রোম ত্যাগ করেন এবং মাৎসিনীর নেতৃত্বে রোমে একটি সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনী এই নবজাত সাধারণতন্ত্রকে ধ্বংস করে এবং মাৎসিনী দেশত্যাগ করে চলে যান।

এদিকে ইটালীয়দের মনে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করতে এবং ইটালীকে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করতে কাভুর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

কাভুর : পিডমণ্টের এক অভিজাত পরিবারে কাউণ্ট ক্যামিলো ডি কাভুরের জন্ম হয়। কাভুর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করে ঐ সমস্ত দেশ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করেছিলেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল কাভুরকে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন।

অস্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করে ইটালীকে পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার নেতৃত্বে এক ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করাই ছিল কাভুরের উদ্দেশ্য। তিনি জানতেন, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রয়োজন পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার শক্তিবৃদ্ধি ও বৈদেশিক সাহায্য।

বিদেশী শক্তির সাহায্য লাভের জন্য তিনি ইঙ্গ-ফ্রান্সের পক্ষে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধের পর তিনি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে আমন্ত্রিত হন এবং ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ও ইংলণ্ডের সহানুভূতি লাভ করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কাভুর তৃতীয় নেপোলিয়নের সঙ্গে এক চুক্তি করেন।


কাভুর

নেপোলিয়ন সার্ডিনিয়াকে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দেন। এর পর কাভুর কৌশলে অস্ট্রিয়াকে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য করেন। ফ্রান্স ও সার্ডিনিয়ার মিলিত বাহিনী অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করে, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার পূর্বেই অস্ট্রিয়ার সঙ্গে তৃতীয় নেপোলিয়নের সন্ধি হয়। এর ফলে সার্ডিনিয়া অস্ট্রিয়ার নিকট থেকে কেবলমাত্র লোম্বার্ডি লাভ করে।

এই সময়ে টাস্কেনি রোমানা, পার্মা প্রভৃতি রাজ্যের অধিবাসীবৃন্দ গণভোটের মাধ্যমে সার্ডিনিয়ার সংগে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। নেপোলিয়নের অনুমোদন লাভের জন্য কাভুর ফ্রান্সকে নিস ও স্যাভয় দান করেন। বিনা বাধায় মধ্য ইটালীর পার্মা, মোডেনা প্রভৃতি রাজ্য সার্ডিনিয়ার সঙ্গে যুক্ত হল এবং ইটালীর ঐক্য বহুদূর অগ্রসর হল।

এই সময়ে দক্ষিণ ইটালীর সিসিলিতে জনসাধারণ বিদ্রোহ শুরু করে এবং বিখ্যাত বিপ্লবী গ্যারিবল্ডীর সাহায্য প্রার্থনা করে।

গ্যারিবল্ডী: গ্যারিবল্ডী ছিলেন মাৎসিনীর শিষ্য। সিসিলির বিদ্রোহীদের আমন্ত্রণে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর এক সহস্র "লালকোর্তা" নিয়ে সিসিলিতে উপস্থিত হন। কিছুদিনের মধ্যে একে একে সিসিলি ও

ন্যাপলসের প্রায় সমস্ত স্থানই তাঁর হস্তগত হয়। ন্যাপলস্-এর পতন ঘটলে গ্যারিবল্ডী ন্যাপলস্ ও সিসিলি ভিক্টর ইমানুয়েলের হাতে ছেড়ে দিয়ে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।



গ্যারিবল্ডী

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে টুরিনে ইটালীর জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে ভিক্টর ইমানুয়েলকে ঐক্যবদ্ধ ইটালীর রাজা বলে ঘোষণা করা হয়।

ম্যাৎসিনীর আবেগময় স্বদেশ-প্রেম, কাভুরের রাজনীতিজ্ঞান ও গ্যারিবল্ডীর বীরত্বের ফলে নতুন ইটালীর জন্ম হয়। কিন্তু ভেনিস ও রোম তখনও পর্যন্ত ইটালীর অন্তর্ভুক্ত হয় নি। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে ইটালী প্রাশিয়ার পক্ষে যোগদান করে। যুদ্ধে অষ্ট্রিয়া পরাজিত হয়ে ভেনিস ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং ভেনিস ইটালীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধেও ইটালী প্রাশিয়ার পক্ষ অবলম্বন করে। ফলে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন রোম থেকে ফরাসী সৈন্য সরিয়ে নিতে বাধ্য হন। এই সুযোগে ইটালী রোম অধিকার করে। এইরূপে প্রায় সমগ্র ইটালীতে এক ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

জার্মানি

ঐক্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে জার্মানির অবস্থা : ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে জার্মান জাতির মধ্যে এক নবজাগরণ সৃষ্টি হয় এবং তারা জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হয়। নেপোলিয়ন জার্মানির ভবিষ্যৎ ঐক্যের পথ প্রশস্ত করেন। তিনি অনেক ক্ষুদ্র রাজ্যের অবসান ঘটিয়ে জার্মানিতে অল্প সংখ্যক রাজ্য গঠন করেন। ভিয়েনা সম্মেলনে ইটালীর

ন্যায় জার্মানির ঐক্যের আশা ব্যর্থ হলেও জার্মানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। যখন ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লবের ঢেউ এসে জার্মানিতে লাগে, তখন জার্মানির জনপ্রতিনিধিগণ ফ্রাংকফুর্টে এক জাতীয় মহাসভায় মিলিত হন এবং প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়মের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ জার্মানি গঠনের সিদ্ধান্ত করেন। শক্তিশালী উন্নতিশীল রাষ্ট্র প্রাশিয়া এই কার্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিল। এই সময় জার্মানির রাজনীতিতে বিসমার্ক নামে এক জনপ্রিয় নেতার আবির্ভাবে ঐক্যবদ্ধ জার্মানি গঠনের আশা আরও দৃঢ়তর হল।

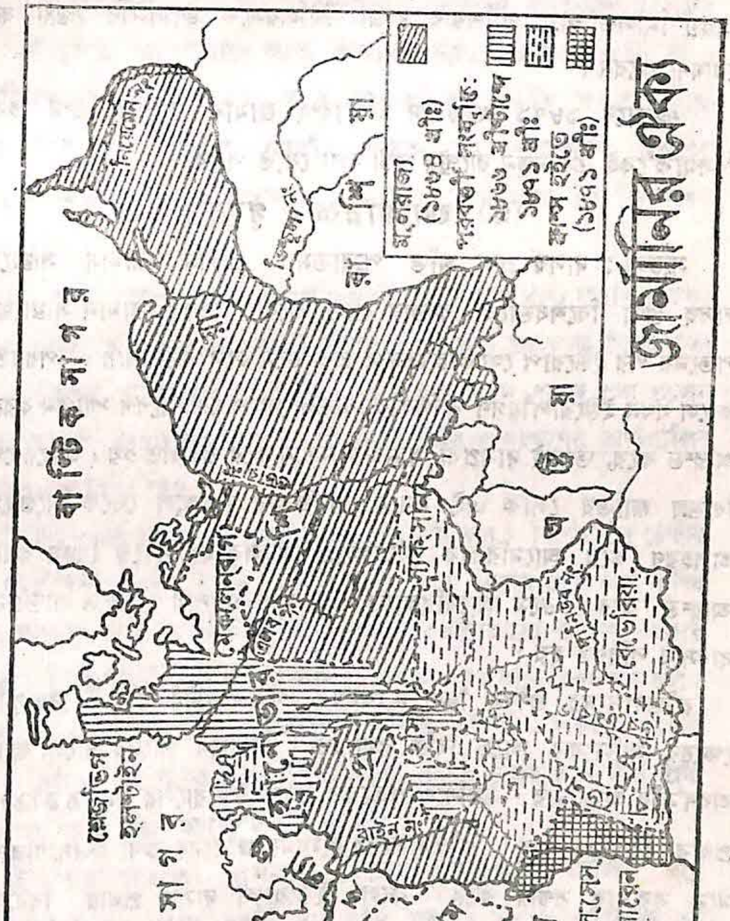
বিসমার্ক: অটোভন বিসমার্ক ছিলেন প্রকৃত শক্তিশালী নেতা। ব্রাণ্ডেন বার্গের এক অভিজাত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পূর্বে বিসমার্ক ফ্রান্স ও রাশিয়ার রাজদূতরূপে কাজ করেন। তিনি গণতন্ত্র ও প্রগতিশীল আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন বটে কিন্তু প্রাশিয়ার নেতৃত্বে শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ জার্মানি গঠন করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। বিসমার্ক জানতেন যে, এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে। সেজন্য তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীকে সুশিক্ষিত ও শক্তিশালী করে তোলেন।



বিসমার্ক

ডেনমার্কের রাজার শাসনাধীন শ্লেজভিগ ও হলস্টাইন নামক দুটি জার্মান প্রদেশের উদ্ধারের জন্য বিসমার্ক অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে মিলিত হয়ে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং এই যুদ্ধে ডেনমার্ক পরাজিত হয়। কিন্তু ঐ দুই প্রদেশের ভাগ নিয়ে প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। বিসমার্ক ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কৌশলে অষ্ট্রিয়াকে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য করেন। অষ্ট্রিয়ার কাছ থেকে ভেনিশিয়া লাভের আশায় ইটালী প্রাশিয়ার সঙ্গে যোগ দেয়। যুদ্ধে অষ্ট্রিয়া

সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং বিসমার্ক শ্লেজভিগ, হলস্টাইন, হ্যানোভার, হেসি, ফ্রাংকফুর্ট প্রভৃতি প্রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত করেন। ইটালী ভেনিশিয়া লাভ করে।



বিসমার্ক জানতেন ফ্রান্সের সঙ্গে সংগ্রাম ব্যতীত তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তৃতীয় নেপোলিয়নও তাঁর সীমান্তে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী জার্মান রাষ্ট্র সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। এখানেও বিসমার্কের কৌশলে

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। যুদ্ধে ফ্রান্স শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয় এবং প্রাশিয়া আলসেস ও লোরেন প্রদেশ লাভ করে। এই সময় জার্মান রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিগণ একত্র মিলিত হয়ে প্রাশিয়ার রাজা উইলিয়মকে জার্মানীর সম্রাট বলে ঘোষণা করেন।

এইভাবে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্রের জন্ম হয় বিসমার্ককেই এই নতুন রাষ্ট্রের স্রষ্টা বলা যেতে পারে।

(গ) আমেরিকার গৃহযুদ্ধ

সূচনা : দাসত্ব প্রথা অতি পুরাতন। প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যে দাসত্ব প্রথা বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপ থেকে ক্রীতদাস প্রথা ক্রমে ক্রমে উঠে যায়। পরবর্তী কালে যখন ইউরোপীয়গণ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে উপনিবেশ স্থাপন করতে আরম্ভ করে, তখনই দাসপ্রথা পুনরায় নতুন করে প্রচলিত হয়। ইউরোপের বিভিন্ন জাতির লোক এই সময়ে আফ্রিকার উপকূল থেকে নিগ্রোদের অপহরণ করে আমেরিকার কৃষিক্ষেত্রের মালিকদের কাছে বিক্রয় করতে আরম্ভ করে। ক্রমে আমেরিকাতে এই দাস-ব্যবসায় অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়।

ক্রীতদাসদের জীবন ছিল দুঃখময়। গরু-ভেড়ার ন্যায় তাদের কৃষি-ক্ষেত্রের মালিকের কাছে বিক্রি করা হত। সেখানে তাদের ভাগ্যে জুটত অবর্ণনীয় অত্যাচার। উনবিংশ শতকের প্রথমে ইউরোপের জনমত ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে যায়। ক্রীতদাসদের দুঃখময় জীবনের কথা জনসাধারণের মনে করুণার সঞ্চার করে। ফলে ইউরোপে দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনের ঢেউ আমেরিকাতে এসেও উপস্থিত হয় এবং দাস প্রথার বিরুদ্ধে সেখানেও আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কারণসমূহ : এই দাস প্রথার উচ্ছেদ নিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এক বিরোধ দেখা দিল। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাংশের রাষ্ট্রগুলি

শিল্পে, বাণিজ্যে সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। ঐ শিল্প প্রধান অঞ্চলে দাস-শ্রমিক অপেক্ষা স্বাধীন শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা ছিল বেশী। সুতরাং, ক্রীতদাস রাখার বিশেষ কোন প্রয়োজন না থাকায় উত্তরের রাষ্ট্রগুলি দাসত্ব প্রথার বিরোধী ছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশের রাষ্ট্রগুলিতে বৃহৎ বৃহৎ কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে আখ, তামাক, তুলা প্রভৃতি উৎপাদন হত। এই কৃষিক্ষেত্রের মালিকেরা মনে করত দাস-শ্রমিক ব্যতীত তাদের কাজ চলতে পারে না। সুতরাং স্বাধীন শ্রমিক-প্রথার পক্ষপাতী উত্তরের রাষ্ট্রগুলি ও দাসত্ব প্রথার সমর্থক দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এক বিরোধের সূচনা হয়।

এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমে কতকগুলি নতুন রাষ্ট্র স্থাপিত হয়। উত্তরের রাষ্ট্রগুলি এই নতুন প্রদেশগুলিতে দাসত্ব প্রথা প্রচলনের বিরোধীতা করে। কিন্তু দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি এই সকল স্থানে দাসত্ব প্রথা প্রচলন বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর হয়। এই নিয়ে উত্তর ও দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়।

আপোষে এই বিরোধের মীমাংসার চেষ্টা করা হল। কিন্তু সে চেষ্টার ফল বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। দাস প্রথা নিয়ে বিদ্বেষ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেতে লাগল। ঠিক এ অবস্থায় মিস হ্যারিয়েট বীচার স্টো-র 'টম কাকার কুটীর' (Uncle Tom's Cabin) নামক পুস্তকটি প্রকাশিত হল। এই পুস্তকে ক্রীতদাসদের শোচনীয় দুর্দশার কথা মর্মস্পর্শী ভাষায় লিখিত ছিল। এই পুস্তক প্রকাশের ফলে সমস্ত উত্তরাঞ্চলে দাস প্রথা বিলোপের পক্ষে প্রবল আন্দোলন শুরু হল।

এই পরিস্থিতিতে দাস-প্রথা বিরোধী শক্তিগুলি মিলিত হয়ে 'সাধারণতন্ত্রী' দল নামে একটি দল গঠন করল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে এই সাধারণতন্ত্রী দলের রাষ্ট্রগুলির মনোনীত প্রার্থী আব্রাহাম লিংকন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির পদে নির্বাচিত হন এবং নির্বাচনের ফলেই উত্তর ও দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুদ্ধ বাধে।

আব্রাহাম লিংকনের ভূমিকা : ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে আব্রাহাম লিংকন জন্ম গ্রহণ করেন। এক দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তিনি অসাধারণ

শারীরিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। লিংকন দাসত্ব প্রথার চরম বিরোধী ছিলেন। তাঁর জীবনের দুটি উদ্দেশ্য ছিল। একটি হল আমেরিকা থেকে দাস প্রথার উচ্ছেদ সাধন করা এবং অপরটি হল যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতা বজায় রাখা।

দাসত্ব প্রথার বিরোধী আব্রাহাম লিংকন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি নিযুক্ত হলে দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি মনে করল যে, এইবার দেশ থেকে দাসত্ব প্রথা উচ্ছেদ করা হবে। সুতরাং তারা যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাইরে এসে নতুন এক রাষ্ট্রসংঘ গঠন করল। লিঙ্কন দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলির এই কাজকে শাসনতন্ত্রের বিরোধী বলে মনে করলেন। সুতরাং, তিনি বল-প্রয়োগ করে দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলিকে যুক্ত রাখবার সংকল্প করেন। ফলে উত্তরের রাষ্ট্রগুলির সংগে দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলির গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়।



আব্রাহাম লিংকন

প্রায় পাঁচ বছর ধরে এই যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধের মধ্যেই ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আব্রাহাম লিংকন দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ ঘোষণা করেন। এই গৃহযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত উত্তরের রাষ্ট্রগুলি জয়লাভ করে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় ঐক্য অব্যাহত থাকে ও আমেরিকার নিগ্রো অধিবাসীগণ নাগরিক অধিকার পায়॥

(ঘ) ইউরোপের শিল্পায়ন (যন্ত্র সভ্যতা)

ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লব ক্রমে ইউরোপের দেশগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ে। ইটালী, অষ্ট্রিয়া, জার্মানি, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে শিল্পের দ্রুত অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। নতুন নতুন যন্ত্রের সাহায্যে পণ্য সামগ্রী উৎপাদনের ফলে এই সব দেশে মানব-সভ্যতার উন্নতি ঘটে এবং ইউরোপের যন্ত্র সভ্যতার যুগ শুরু হয়। শিল্পের প্রয়োজনে নতুন নতুন যন্ত্রের উদ্ভাবন হতে থাকে। ক্রমে মানুষ যন্ত্রের দাসে পরিণত হয়। বিত্তবান লোকেরা শিল্পে অর্থ

বিনিয়োগ করতে থাকলে দেশে বড় বড় কল-কারখানা গড়ে ওঠে। ফলে শহরে কর্মপ্রার্থীদের ভীড় বাড়তে শুরু হল এবং শহরের চারদিকে বসতি গড়ে উঠতে লাগল। শিল্পকে আশ্রয় করে ইউরোপীয় সমাজ ও অর্থনীতির যে রূপরেখা গড়ে ওঠে তাকে বলা হয় শিল্পায়ন। যন্ত্রের দৌলতে সমাজ-জীবনের চেহারা পাল্টে গেল। তাই সভ্যতার আর এক নাম যন্ত্র সভ্যতা।

ফলাফল : প্রথমতঃ, শিল্পায়নের ফলে অল্প পরিশ্রমে অধিক উৎপাদন সম্ভব হল। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তার লাভ করল এবং ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেল।

দ্বিতীয়তঃ, মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা মত প্রতিটি জিনিসের উৎপাদনের ফলে মানুষের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য বেড়ে গেল। সমাজ-জীবনে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগল।

তৃতীয়তঃ জমিদারদের নানারকম অত্যাচারের ফলে কৃষিজীবীরা চাষাবাদ ত্যাগ করে দলে দলে কারখানায় এসে শ্রমিকদের দল ভারী করতে লাগল।

চতুর্থতঃ, শিল্পায়নের উল্লেখযোগ্য ফল হল পুঁজিবাদের জন্ম। সমাজে মালিক ও শ্রমিক দুটি শ্রেণীর উদ্ভব হল। মালিক শ্রেণী ধনী থেকে ধনীতর হতে লাগল, আর তাদের শোষণে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হতে লাগল। ফলে শ্রমিকেরা তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য শ্রমিক সংঘ গড়ে তুলল এবং ন্যায্য অধিকার দাবি করল। এইভাবেই আওয়েন প্রমুখ নেতার পরিচালনায় ইংলণ্ডে শুরু হয়েছিল চার্টিস্ট আন্দোলন।

পুঁজিবাদের বিকল্প হিসাবে ইউরোপে সমাজতন্ত্রবাদ দেখা দিল। সমাজতন্ত্রবাদের মূল কথা হল—কল-কারখানা, জমি-জমা সব কিছুরই মালিক রাষ্ট্র। এগুলি থেকে অর্জিত আয়ে সকলেরই সমান অধিকার থাকবে। শ্রমের বিনিময়ে রাষ্ট্র সকলেরই ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবে। এরূপ আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের জনক ছিলেন কার্ল মার্কস।

কার্ল মার্কস : ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কার্ল মার্কস জার্মানির রাইনল্যান্ড-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে ছিলেন ইহুদী। তিনি বার্লিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ইতিহাস, দর্শন এবং আইন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

মার্কস জার্মানির বিখ্যাত দার্শনিক হেগেলের মতবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি জার্মানির বৈপ্লবিক আন্দোলনের সংগে যুক্ত হন এবং একটি বামপন্থী সংবাদপত্রের সম্পাদনা করেন। প্রাশিয়া সরকার তাঁকে দেশ থেকে নির্বাসিত করলে তিনি প্যারিসে চলে আসেন এবং পরে সেখান থেকে ব্রাসেলসে যান। সেখানে তিনি সমাজতন্ত্রবাদী ফ্রেডারিক এংগেলস-এর সহযোগিতায় ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে 'সাম্যবাদী ইস্তাহার' প্রকাশ করেন। এর মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তীকালে তিনি ইংলণ্ডে আশ্রয় নেন এবং তাঁর বিখ্যাত বই 'ডাস্ ক্যাপিটাল' রচনা করেন।


কার্ল মার্কস

মার্কসের মতে মানব জাতির ইতিহাস অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তিনি বলেন, মানব জাতির ইতিহাস হল অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সংগ্রামের কাহিনী। তাঁর এই মতবাদ সর্বপ্রথম রাশিয়াতে সাফল্য লাভ করে। কার্ল মার্কসের মতবাদকে বলা হয় সাম্যবাদ।

এংগেলস : এংগেলস্ ছিলেন কার্ল মার্কসের বন্ধু। জার্মানির বারসেন শহরে তাঁর জন্ম হয়। কার্ল মার্কস যখন প্যারিসে যান তখন সেখানেই এংগেলস-এর সংগে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তারপর মার্কস এবং এংগেলস একসংগে ব্রাসেলস-এ যান। মার্কসের মতবাদ ব্যাখ্যা করে এংগেলস কয়েকটি বই লিখেছিলেন। 'সাম্যবাদী ইস্তাহার' বইটি মার্কস এবং এংগেলস্ দুজনে মিলে রচনা করেছিলেন।

কালক্রম

ভিয়েনা সম্মেলন	১৮১৫ খ্রী:
মেটারনিকের যুগ	১৮১৫-১৮৪৮ খ্রীঃ
চতুঃশক্তি মিতালি	১৮১৫ খ্রীঃ
মাৎসিনী	১৮০৫-১৮৭২ খ্রীঃ
কাভুর	১৮১০-১৮৬১ খ্রী:
গ্যারিবল্ডী	১৮০৭-১৮৮২ খ্রীঃ
বিসমার্ক	১৮১৫-১৯১৮ খ্রীঃ
আব্রাহাম লিংকন	১৮০৯-১৮৬৫ খ্রী:
কার্ল মার্কস	১৮১৮-১৮৮৩ খ্রীঃ

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। ভিয়েনা সম্মেলনের দ্বারা কিভাবে ইউরোপের জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের ভাবধারা নষ্ট হয়েছিল ?

২। বিচ্ছিন্ন ইটালী কিভাবে ঐক্যলাভ করল সে কাহিনী লেখ।

৩। কিভাবে জার্মানি সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হয় তার বিবরণ দাও।

৪। আমেরিকার গৃহযুদ্ধে আব্রাহাম লিংকনের ভূমিকা উল্লেখ কর।

৫। ইউরোপের যন্ত্র সভ্যতা ও তার প্রভাব বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। মেটারনিক সম্পর্কে কি জান ?

২। চতুঃশক্তি মিতালি কাদের মধ্যে হয়েছিল এবং কেন ?

৩। ইটালীর ঐক্য স্থাপনে মাৎসিনীর অবদান বর্ণনা কর।

৪। ঐক্য লাভের পূর্বে জার্মানির অবস্থা কিরূপ ছিল ?

৫। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের মূল কারণ কি ?

৬। কার্ল মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ সম্বন্ধে যা জান লেখ।

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। দু এক কথায় উত্তর দাও ঃ—

(ক) ভিয়েনা সম্মেলনের সভাপতি কে ছিলেন ?

(খ) নবীন ইটালীর স্রষ্টার তিনজন নেতার নাম কর।

(গ) বিসমার্ক কে ছিলেন ?

(ঘ) 'টম কাকার কুটীর' বইটি কার লেখা ?

(ঙ) আব্রাহাম লিংকন কে ছিলেন ?

(চ) কাকে 'আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের জনক' বলা হয় ?

দশম অধ্যায়

(ক) চীনের ঘটনা প্রবাহ (১৯১১ খ্রীঃ পর্যন্ত)

বর্তমান যুগের প্রথমভাগে চীন সাম্রাজ্য পশ্চিমের ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি যে কোন দেশে অপেক্ষা যেমন বড় ছিল, তেমনি ধনে, জনে, শিল্পে ও সভ্যতায় শ্রেষ্ঠ ছিল। নিজ সভ্যতার অভিমানে চীন পাশ্চাত্য জগৎকে হীনচক্ষে দেখত, পাশ্চাত্যের বণিকদের তেমন আমল দিত না এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা প্রয়োজন মনে করত না। তারপর উনিশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডের চাপে চীন পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধ্য হয়। এর পর থেকে চীন পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা পদে পদে লাঞ্ছিত হতে থাকে।

(১) আহিফেন যুদ্ধ : চীনের সংকট আসন্ন হল ইংরেজগণকে উপলক্ষ্য করে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা চীনদেশে আফিম রপ্তানি করত। কিন্তু আফিম সেবন দেশবাসীর পক্ষে ক্ষতিকর বলে চীন সম্রাট তা একেবারে বন্ধ করে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। তখন থেকে আরম্ভ হল চীনে গোপন আফিম রপ্তানি। আফিম রপ্তানি করে ইংরেজগণ বহু অর্থের অধিকারী হল। এই গোপন ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল ছিল ক্যাণ্টন। চীন সম্রাট আফিমের গোপন ব্যবসা বন্ধ করতে তাঁর একজন রাজকর্মচারীকে ক্যান্টন পাঠিয়ে দিলেন। তিনি প্রায় বিশ হাজার আফিমের বাক্স উদ্ধার করে তা নষ্ট করে ফেলেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ইংরেজ বণিকদের পক্ষ অবলম্বন করে চীনের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করলে চীন সম্রাট তা দিতে অস্বীকৃত হন। চীন সম্রাটের ঔদ্ধত্যে ইংরেজরা ক্ষুব্ধ হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। এইভাবে ইংরেজ ও চীনের মধ্যে এক যুদ্ধ আরম্ভ হল (১৮৩৯-৪২ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধ 'আহিফেন যুদ্ধ' নামে পরিচিত। এই যুদ্ধ চীনের সৈন্যগণ পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করতে লাগল। অবশেষে তারা ইংরেজদের অপমানজনক নানকিং চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হল।

নানকিং এর-সন্ধি (১৮৪২ খ্রীঃ)এবং ব্রিটিশ বাণিজ্যচুক্তি : নানকিং-এর সন্ধি দ্বারা আহিফেন যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। এই সন্ধিতে স্থির হল যে, ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ ক্যান্টন, এময়, ফুচাও, নিংপো এবং সাংহাই

বন্দরে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে যাতায়াত করতে পারবে। হংকং ইংরেজগণের হাতে সমর্পিত হল। যে আফিমের ব্যাপার নিয়ে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সন্ধির শর্তাদির মধ্যে সে বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করা হল না। আফিমের ব্যবহার চীন দেশে পূর্বের মত চলতে লাগল। ইংরেজগণ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ চীনের নিকট হতে প্রচুর অর্থ আদায় করল।

ইংরেজ বণিকেরা ইতিপূর্বে চীনের এক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের ব্যবসা করত। এখন পূর্বেকার আইন বাতিল বলে ঘোষিত হল। চীনের সংগে ইংরেজদের নতুন বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদিত হল। এই চুক্তির ফলে ইংরেজ বণিকেরা চীনে সরাসরি ব্যবসা করার সুযোগ পেল।

টিয়েনসিনের সন্ধি—বন্দর-চুক্তি : অহিফেন যুদ্ধে চীনের দুর্বলতা ইউরোপীয়দের কাছে ধরা পড়ে যায়। তাই মাত্র পাঁচটি বন্দরে ব্যবসা করার অধিকার পেয়ে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি সন্তুষ্ট থাকল না। চীনের আরও বন্দর অধিকার করার লোভে তাদেরকে পেয়ে বসল। অহিফেন যুদ্ধের মাত্র পনের বছর পরে তুচ্ছ এক অজুহাতে আবার ইংরেজরা চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ফরাসীরাও ইংরেজদের সংগে যুদ্ধে যোগ দিল। এবারও চীনের পরাজয় ঘটতে থাকে। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 'টিয়েনসিনের সন্ধি' দ্বারা এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। ইংরেজ ও ফরাসীগণ চীনের নিকট ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রচুর অর্থ লাভ করে। এক বন্দর-চুক্তির ফলে আরো এগারোটি বন্দরে ইউরোপীয়গণ বাণিজ্য করার অধিকার পায়। তাছাড়া চীন পরে হংকং বন্দরটি ইংরেজদের নিকট হস্তান্তরিত করে। এই ভাবে চীনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিদেশীগণ সেখানে অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজ্য গ্রাস আরম্ভ করে।

চীনে বিদেশীদের বসতি ও অতিরাষ্ট্রিক অধিকার লাভ : এতদিন চীন বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছন্ন ছিল। এবার বিদেশীরা দলে দলে সেখানে প্রবেশ করতে লাগল। ইংরেজ ও ফরাসীদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রগুলিও চীনে বসতি বিস্তার শুরু করে দিল।

শুধু তাই নয়, বিদেশীরা চীনে কতকগুলি অতিরাষ্ট্রিক অধিকারও

লাভ করল। যে সব বন্দরে তারা বাণিজ্যিক অধিকার পেল সেই সব বন্দরে চীনের আইন তাদের উপর প্রযোজ্য হবে না এবং তারা সেখানে নিজেদের দেশের আইনের সুবিধা লাভ করবে। চীনে বসবাসকারী ইউরোপীয় মিশনারীরাও এই সুযোগ সুবিধা দাবি করে বসল। চীনে বিদেশীদের দূতাবাস স্থাপনের ব্যবস্থা হল। চীন সরকারকে বিদেশী বণিকদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে বাধ্য করা হল। এমন কি বহির্বাণিজ্যের শুল্ক সংক্রান্ত কর্তৃত্বভার ইউরোপীয়দের হাতে সমর্পণ করতে হল। দেখা গেল বিদেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ইংলণ্ড বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে চীনে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাল এবং নিজেদের আধিপত্য সুদৃঢ় করল।

চীনে বিদেশী শক্তি সমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা : ইংলণ্ডের দৃষ্টান্তে রাশিয়া, ফ্রান্স, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ চীনকে তাদের সংগে বাণিজ্যচুক্তি করতে বাধ্য করল। উত্তর দিকে রাশিয়া চীনের মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ এবং দক্ষিণ দিকে ফ্রান্স ইন্দোচীন গ্রাস করতে লাগল। রাশিয়া চীনকে পোর্ট আর্থার বন্দরটি তার নিকট ইজারা দিতে বাধ্য করল। জার্মানি কিয়াও চাও বন্দরে এবং শান্টুং প্রদেশে অধিকার বিস্তার করল। ইংরেজরা ইজারা নিল ওয়েই-হেই-ওয়েই। জাপানও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের ন্যায় চীনের দুর্বলতার সুযোগ নিতে ছাড়ল না। জাপানের লক্ষ্য চীনের অধীনস্থ কোরিয়া দেশটিতে ভবিষ্যতে জাপানের বাড়তি লোকদের জন্য উপনিবেশ স্থাপন করা। তাই জাপান কোরিয়ার উপর চীনের আধিপত্য অস্বীকার করল। এইভাবে চীনকে বিভিন্ন অংশে খণ্ড-বিখণ্ড করা হল এবং তাকে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।

হের উন্মুক্তদ্বার নীতি (১৯০১ খ্রীঃ) চীনের দুর্দশা যখন এইভাবে বেড়েই চলল তখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তার ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতির আশংকায় চীন সাম্রাজ্যকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভাগাভাগি করতে বাধা দিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পররাষ্ট্র সচিব হে দাবি করলেন যে, চীনের যে কোন অঞ্চল যে কোন দেশের বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। কেউ কোন নির্দিষ্ট এলাকায় একচেটিয়া অধিকার ভোগ করতে পারবে না। অবস্থা বুঝে ইংলণ্ড ও জার্মানি এই নীতিকে সমর্থন করল।

ফলে হের উন্মুক্ত-দ্বার নীতি (১৯০১ খ্রীঃ) দ্বারা চীনের অখণ্ডতা রক্ষা পেল।

(২) চীনের প্রতিক্রিয়া—তাইপিং বিদ্রোহ (১৮৫৩ খ্রীঃ) : চীনের এই দুর্দশা দেখে চীনের দেশপ্রেমিকদের মধ্যে এক গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তাঁরা বেশ বুঝতে পারলেন যে, মাঞ্চু সরকারের অপদার্থতার জন্যই বিদেশী শয়তানরা চীনে ঘাঁটি স্থাপন করে বসেছে এবং তাদের উপরে শোষণ চালাচ্ছে। তাই তাঁরা মাঞ্চু সরকারের পতন ঘটিয়ে নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইলেন।

এই সময়ে চীনে এক ধর্ম আন্দোলন শুরু হল। এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন হুঙ-মিউ-চুয়ান নামে একজন ধর্ম প্রচারক। এই আন্দোলন বা বিদ্রোহ 'তাইপিং বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। 'তাইপিং' শব্দের অর্থ পবিত্র রাজ্য। হুঙ্-এর মতবাদের সংগে খ্রীষ্টানদের প্রোটেস্ট্যাণ্ট মতবাদের কিছুটা মিল আছে। তাইপিং বিদ্রোহের প্রথমে ধর্মীয় আন্দোলনরূপে প্রকাশ পেলেও আসলে এটি চীনে নতুন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য মাঞ্চু সরকারের বিরুদ্ধে হুঙ্-এর এক রাজনৈতিক আন্দোলন। হুঙ্ তাঁর অনুচরদের নিয়ে কোয়াংসি থেকে উত্তর দিকে অভিযান করেন। তারা ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে চীনের দ্বিতীয় রাজধানী নানকিং অবরোধ করে।

অবশেষে বিপদ বুঝে মাঞ্চু সরকার বিদেশীদের সামরিক সাহায্য নিয়ে এই বিদ্রোহ দমন করেন। আমেরিকার সেনাপতি ওয়ার্ড এবং ইংরেজ সেনাপতি গর্ডন বিদ্রোহ দমনে মাঞ্চু সরকারকে সাহায্য করেন। এইভাবে তাইপিং বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

একশো দিনের সংস্কার (১৮৯৮ খ্রীঃ) : ইতিমধ্যে চীন-জাপান যুদ্ধে (১৮৯৪-৯৫ খ্রীঃ) চীনের পরাজয় ঘটে। বার বার বিদেশীদের কাছে পরাজয়ের ফলে চীনের দুর্বলতার কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং এই দুর্বলতার সুযোগ বিদেশীরা চীনের নিকট নিত্য নতুন সুবিধা আদায় করতে থাকে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও রীতি-নীতি প্রবর্তনের দ্বারাই কেবল চীন আত্মরক্ষা করতে পারে—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে চীনের সংস্কার পন্থীরা এক আন্দোলন শুরু করে। সম্রাট কোয়াং-সু এই আন্দোলনের

সমর্থক ছিলেন। তিনি তিন মাসের অধিক সময় (১১ই জুন—২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮ খ্রীঃ) ধরে নানাবিধ সংস্কার প্রবর্তন করেন। কোয়াং-সু প্রবর্তিত এই সংস্কারগুলিকে তাই 'একশ দিনের সংস্কার' বলা হয়। এই সময়ে শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার করে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়। এছাড়া আইন কমিশন নিয়োগ আধুনিক যুদ্ধ বিদ্যার প্রচলন, স্থানীয় সমস্যা নিবারণ প্রভৃতি বিষয়ে কিছু কিছু সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়।

বক্সার বিদ্রোহ—এই সময়ে চীন দেশকে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য দেশপ্রেমিক চীনাবাসীরা বিদেশীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে। ফলে চীনে তখন গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে। ইংরাজীতে এই সমিতিকে বলা হত বক্সার অর্থাৎ মুষ্টি যোদ্ধার দল। বিদেশীদের চীন থেকে বিতাড়িত করবার জন্য বক্সাররা দাংগা হাংগামা আরম্ভ করে। বিভিন্ন শহরে, বিশেষ করে রাজধানী পিকিং-এ এই হাংগামা প্রবল আকার ধারণ করে এবং বিদেশীদের ও দেশীয় খ্রীষ্টানদের হত্যা করা হয়। এই বিক্ষোভ 'বক্সার বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। শেষে বিদেশীদের মিলিত চেষ্টায় এই হাংগামা দমন করা হয়।

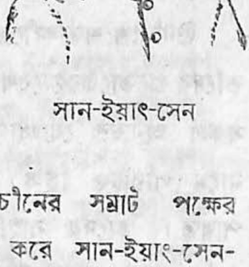
ডাওয়েজার সম্রাজ্ঞীর প্রতিক্রিয়া: কিন্তু প্রাচীন পন্থীরা কোয়াং-সু প্রবর্তিত সংকারের বিরোধিতা করে। বিধবা (ডাওয়েজার) সম্রাজ্ঞী জু-সি নিজেও রক্ষণশীল নীতি সমর্থন করতেন। তিনি এইসব সংস্কার একেবারেই পছন্দ করলেন না। তিনি নিজেই সংস্কার বিরোধীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং সম্রাটকে অপসারিত করে শাসন কর্তৃত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করেন। তিনি কোয়াং-সুর সংস্কারগুলি নাকচ করে দেন।

অভ্যন্তরীণ সংস্কারের নব প্রচেষ্টা (১৯০২-১৯০৮ খ্রীঃ): বিদেশী শত্রুকে বিতাড়িত করবার চেষ্টা ব্যর্থ হলেও বিপ্লবীগণ নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকল না। তাদের কাছে সংস্কারের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হল এবং তারা পুনরায় বিপ্লবের জন্য তৈরী হতে লাগল। তখন মাঞ্চু শাসনকে সম্ভাব্য বিপ্লবের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বুদ্ধিমতী জু-সি অন্য ভূমিকা গ্রহণ করলেন। তিনি অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এক ব্যাপক সংস্কার নীতি গ্রহণ করলেন। ফলে শিক্ষা, শাসন, সামরিক প্রভৃতি বিভাগগুলিকে

পাশ্চাত্য আদর্শে পুনর্গঠন করা হল। দেশের বিদ্যালয়গুলিতে বিদেশ থেকে শিক্ষক আনার ব্যবস্থা হল। দলে দলে যুবকদের শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিদেশে প্রেরণ করা হল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সংস্কার প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল।

শেষ মাঞ্চু সম্রাটের পদচ্যুতি (১৯১১ খ্রীঃ) : এর কিছুকাল পরেই বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী জু-সি প্রাণত্যাগ করেন। জু-সিকে লোকে ভয় ও ভক্তি করত। তাঁর মৃত্যুর পর আর তেমন সুযোগ্য শাসক পাওয়া গেল না। শেষে এক নাবালককে সিংহাসনে বসান হল এবং শাসক চক্রের মধ্যে দলাদলি শুরু হল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে সান-ইয়াৎ-সেনের জাতীয়তাবাদী দলের বিপ্লবের সময় এই শেষ মাঞ্চু সম্রাটের পদচ্যুতি ঘটে। এইভাবে তাঁরা ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে বিদায় নেন।

প্রজাতান্ত্রিক চীন (১৯১২ খ্রীঃ) :—সান-ইয়াৎ-সেন : বিদেশী মাঞ্চু রাজবংশের বিলোপ সাধন করে চীনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল সেই আন্দোলনের নেতা ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন। ডাঃ সান একজন আদর্শবান ও নির্ভিক দেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি ছিলেন আধুনিক চীনের স্রষ্টা। তাঁর নেতৃত্বে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে চীনে একটি রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং পরের বছর দক্ষিণ-চীনে একটি প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। সান-ইয়াৎ-সেন এই প্রজাতান্ত্রিক চীনের প্রথম প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রপতি হলেন।



সান-ইয়াৎ-সেন

ইউ-য়ান-সিকাই : ইউ-য়ান-সিকাই ছিলেন চীনের সম্রাট পক্ষের সেনানায়ক। তিনি চীনে এক গৃহযুদ্ধের আশংকা করে সান-ইয়াৎ-সেন-এর পক্ষে পদত্যাগ করেন। জাতীয় ঐক্য বৃদ্ধি করতে সান-ইয়াৎ-সেন প্রেসিডেণ্ট পদ ত্যাগ করলে ইউ-য়ান সিকাই হলেন প্রজাতন্ত্রী চীনের নতুন রাষ্ট্রপতি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বিদেশী শক্তিবর্গের সহায়তায় নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন।

(খ) জাপানের অভ্যুদয় (১৯৪৪ খ্রীঃ পর্যন্ত)

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের কথা। চীনের সংগে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যের প্রসার হয়েছে, কিন্তু জাপান তখনও বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের পত্রসহ কামোডোর পেরি নামক আমেরিকার এক নৌ-সেনাপতি কয়েকখানা যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে জাপানে আসেন। ঐ পত্রে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট জাপানের শাসনকর্তাকে আমেরিকার সংগে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করতে অনুরোধ করেন। জাপানীরা এই প্রথম কলের জাহাজ দেখল। এডমিরাল পেরির সংগে বড় বড় কামান বসান যুদ্ধ জাহাজ দেখে জাপানীরা বুঝল বলপূর্বক আমেরিকাকে বাধা দেওয়া সম্ভব হবে না। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার সংগে জাপানের চুক্তি হয়। জাপানের দুটি বন্দরে আমেরিকার জাহাজ প্রবেশ করবার অনুমতি পায়। শীঘ্রই ইউরোপীয় জাতিদের সংগেও জাপানকে অনুরূপ চুক্তি করতে হয়। এইরূপে জাপান বাইরের জগতের সংগে সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধ্য হল।

মেইজি যুগে সম্রাটের শক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা (১৮৬৭ খ্রীঃ), সম্রাটের ক্ষমতা ও মর্যাদা ঃ জাপানের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বুঝলেন যে জাপান এক মহাসংকটের সম্মুখীন। জাপানকে পশ্চিমের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে প্রথমেই শাসন ব্যবস্থার সংস্কার করে দেশে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে ; তারপর পশ্চিমের বিদ্যা শিখে পশ্চিমের সংগে যুদ্ধ করতে হবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতেও জাপানে কতকগুলি বড় সামন্ত পরিবার ছিল। তাঁদের প্রত্যেকেরই বেশ কিছু কর্মঠ ও শক্তিশালী অনুচর থাকত। এই সকল অনুচর যোদ্ধাগণ ইউরোপের নাইটদের ন্যায় জাপানে সামুরাই নামে পরিচিত ছিল। সামুরাইগণ অকাতরে প্রাণ নিতে ও দিতে পারত। তাদের সাহায্যে দাইমিও বা সামন্তগণ খুব প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। জাপানীরা তাদের মিকাডো বা সম্রাটকে খুব সম্মান করত। তাঁকে দেবতার বংশধর বলে মনে করে যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হত। কিন্তু দীর্ঘ সাতাশ বছর ধরে জাপানের শাসন ব্যবস্থায় মিকাডোর কোন কর্তৃত্ব ছিল না। দেশ শাসন করতেন 'সোগান' উপাধিধারী প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান

সেনাপতি। সোগান সম্রাটকে খুব সম্মান করতেন কিন্তু শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে দিতেন না। জাপানের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বুঝলেন যে দেশকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করতে হলে সম্রাটকে স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করতে হবে। দেশের ঐ সংকটের সময় সোগান স্বেচ্ছায় সম্রাটের হাতে শাসনভার অর্পণ করলেন। বিনা রক্তপাতে এইরূপ রাষ্ট্র বিপ্লব ইতিহাসে বিরল। সম্রাট মুৎসুহিতো 'মেইজি' উপাধি ধারণ করে শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করলেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এইভাবে জাপানে সম্রাটের শক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়। এই ঘটনার পর থেকেই জাপানে মেইজি যুগের সূচনা হল। মেইজি যুগে জাপানের সম্রাটের প্রতিপত্তি, ক্ষমতা ও মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।

জাপানে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক ব্যবস্থার পাশ্চাত্তীকরণ : শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করে মিকাডো দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক ব্যবস্থাকে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে একেবারে ঢেলে সাজান। মিকাডো প্রথমেই দাইমিও বা সামন্তদের শাসন ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করেন এবং তাদের বিশেষ অধিকারও সুবিধাগুলির অবসান ঘটান। জাপানে ইংলণ্ডের অনুকরণে পার্লামেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মিকাডো জাপানের জন্য একটি গঠনতন্ত্র অনুমোদন করেন।

এই সময় দেশের খনিগুলির উন্নতি সাধন করা হয় এবং নতুন নতুন কল-কারখানা স্থাপন করা হয়। নতুন নতুন কল-কারখানা স্থাপনের ফলে জাপানের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়।

পশ্চিমের নানা বিদ্যা আয়ত্ত করবার জন্য মিকাডো দলে দলে যুবকদের বিদেশে প্রেরণ করেন। তারা পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্য-নীতি আয়ত্ত করল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে জাপান বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তন করে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিদেশী শিক্ষকদের আমন্ত্রণ করা হয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যাতে দেশে প্রচারিত হতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়। ইংরাজী ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করা হয়। খ্রীষ্টধর্মের প্রতি সমস্ত বিধি-নিষেধ তুলে নেওয়া হয়। অল্প দিনের মধ্যে জাপানে রেলপথ, টেলিগ্রাফ, বাষ্পীয় পোত প্রভৃতির প্রবর্তন হয়।

সামুরাই শ্রেণীকে উচ্ছেদ করে জাতীয় সৈন্যদল গঠন করা হয়। জার্মান বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে এই সৈন্যদলকে সুশিক্ষিত করা হয়। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করে সৈন্যবাহিনীকে শক্তিশালী করা হয়। এই সময়ে জাপান একটি নৌ-বাহিনীও গঠন করে। এইভাবে একটি মধ্যযুগীয় দুর্বল রাষ্ট্র থেকে জাপান কয়েক বছরের মধ্যে আধুনিক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হল।

চীন-জাপান যুদ্ধ (১৮৯৪-৯৫ খ্রীঃ) জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সূচনাঃ জাপান কেবল পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পনীতি গ্রহণ করল না, পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদ নীতিটিও গ্রহণ করল। জাপান একটি ক্ষুদ্র দেশ। কিন্তু দেশের আয়তনের তুলনায় সেখানের লোকসংখ্যা খুব বেশী। তাই খাদ্যদ্রব্য, বাসস্থান ও নিজদেশের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করবার জন্য জাপান পররাজ্য গ্রাস করবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করল। এই উদ্দেশ্যে জাপান চীনের অধীনস্থ কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়াতে ভবিষ্যতে উপনিবেশ স্থাপন করতে সচেষ্টা হল। কোরিয়ার উপর চীনের আধিপত্য মানতে রাজী না হওয়ায় চীনের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ বাধে (১৮৯৪-৯৫ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধে জাপান চীনকে পরাজিত করে এবং সিমেনোসেকির সন্ধিতে স্বাক্ষর করতে তাকে বাধ্য করে। সিমেনোসেকির সন্ধির শর্ত অনুসারে কোরিয়াকে স্বাধীন দেশ বলে ঘোষণা করা হলেও এই অঞ্চলটি জাপানের প্রভাবাধীন হল। তাছাড়া মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণের একাংশ জাপানের হাতে এল। কিন্তু এই অঞ্চলের উপর রাশিয়ার লোভ ছিল। এজন্য রাশিয়ার চাপে জাপান এই অংশটি চীনকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। ফলে জাপানীদের মনে এক অপমানের আগুন জ্বলতে থাকে এবং তারা রাশিয়ার সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত হতে থাকে।

ইংগ-জাপান মৈত্রী (১৯০২ খ্রীঃ)ঃ এই সময়ে রাশিয়া কেবল জাপানের শত্রু ছিল না, ইংলণ্ডেরও শত্রু ছিল। তাই রাশিয়াকে জব্দ করার জন্য ইংলণ্ড ও জাপান এই দুই দেশের মধ্যে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে একটি মৈত্রী চুক্তি হল। স্থির হল যে, চীনে ইংরেজদের স্বার্থ জাপান মেনে নেবে; আর কোরিয়াতে জাপানের প্রভাব ইংলণ্ড স্বীকার করবে।

ফলে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে জাপানের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সুযোগ হল।

রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪-১৯০৫ খ্রীঃ) : চীন-জাপান যুদ্ধের পরেই পাশ্চাত্য শক্তিগুলি দুর্বল চীনের কয়েকটি প্রদেশ দখল করে নিল। এই সুযোগে রাশিয়া ধীরে ধীরে মাঞ্চুরিয়া গ্রাস করতে উদ্যত হল। এতে ভীত হয়ে জাপান রাশিয়াকে মাঞ্চুরিয়া থেকে সৈন্য সরিয়ে নিতে বলল। রাশিয়া জাপানের দাবি অগ্রাহ্য করায় উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধল (১৯০৪ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধে রাশিয়া সম্পূর্ণরূপে জাপানের নিকট পরাজিত হল।

পোর্টস্‌মাউথের সন্ধির দ্বারা রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া থেকে সৈন্য সরিয়ে নিতে বাধ্য হল এবং মাঞ্চুরিয়ায় জাপান ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা আদায় করে নিল। জাপান রাশিয়ার নিকট থেকে পোর্ট-আর্থার বন্দর সহ লিয়াওটাং উপদ্বীপ ফিরে পেল। মাঞ্চুরিয়া এবং কোরিয়াতে জাপানের প্রভাব বৃদ্ধি পেল। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ইউরোপীয় শক্তিগুলি জাপানকে তাদের সমকক্ষ শক্তি হিসাবে মেনে নিল।

কোরিয়া দখল (১৯১০ খ্রীঃ) : রাশিয়ার মত এক বিশাল দেশকে পরাজিত করে জাপানের আত্মপ্রত্যয় বেড়ে গেল এবং জাপান আরও সাম্রাজ্যবাদী হয়ে উঠল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে জাপান কোরিয়া দখল করল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দুর্বল চীনের উপর জাপানের ২১ দফা দাবি : কোরিয়া দখল করেও জাপানের রাজ্য লিপ্সা মিটল না। কয়েক বছরের মধ্যেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে (১৯১৪ খ্রীঃ) জাপান জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয় এবং চীনে জার্মানির অধিকৃত কিয়া চো প্রভৃতি বন্দর অধিকার করে নেয়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীনের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ইউ-য়ান-সিকাই-এর নিকট ২১ দফা দাবি জানায়। জাপান দাবি করে যে, মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়াতে জাপানের অধিকার মেনে নিতে হবে; ব্যবসা-বাণিজ্যে জাপানকে বেশী সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে ইত্যাদি। চীন জাপানের ২১ দফা দাবির অধিকাংশই মেনে নিল। প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে চীনের প্রতিনিধি এর প্রতিকার চাইলেন। কিন্তু পরিস্থিতি

বিবেচনা করে কেউ চীনকে সমর্থন করতে সাহস পেল না। দেখতে দেখতে জাপান পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হল।

কালক্রম

অহিফেন যুদ্ধ	১৮৩৯ খ্রীঃ
নানকিং-এর সন্ধি	১৮৪২ খ্রীঃ
তাইপিং বিদ্রোহ	১৮৫০খ্রীঃ
টিয়েনসিনের সন্ধি	১৮৫৮ খ্রীঃ
বক্সার বিদ্রোহ	১৯০০ খ্রীঃ

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। চীনের অহিফেন যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।
২। কিভাবে ইউরোপীয়রা চীনের রুদ্ধদ্বার উন্মোচন করেছিল? চীনের কোন্ কোন্ স্থানে তারা প্রভাব বিস্তার করেছিল?
৩। তাইপিং বিদ্রোহের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।
৪। বক্সার বিদ্রোহ কেন এবং কিভাবে হয়েছিল?
৫। সম্রাজ্ঞী জু-সি কর্তৃক চীনের অভ্যন্তরীণ সংস্কারগুলি উল্লেখ কর।
৬। কিভাবে চীনে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।
৭। চীন-জাপান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল উল্লেখ কর।
৮। রুশ-জাপান যুদ্ধ কেন হয়েছিল? এর ফল কি হয়েছিল?

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। নানকিং সন্ধির শর্তগুলি কি কি ছিল?
২। টিয়েনসিনের সন্ধির শর্তগুলি উল্লেখ কর।
৩। বিদেশীরা চীনে কি কি অতিরাষ্ট্রিক অধিকার ভোগ করেছিল।
৪। হের উন্মুক্তদ্বার নীতি বলতে কি বোঝ?
৫। চীনের কোন্ সম্রাট 'একশ দিনের সংস্কার' করেছিলেন?
৬। সান্-ইয়াৎ-সেন ও ইউ-য়ান-সিকাই সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। সঠিক উক্তিটির পাশে চিহ্ন দাও ঃ
(ক) চীনের তাইপিং বিদ্রোহে নেতা ছিলেন সুঙ্-সিউ-চুয়েন/ইউ-য়ান সিকাই।
(খ) একশ দিনের সংস্কার প্রবর্তন করেন সম্রাজ্ঞী জু-সি/সম্রাট কোয়াংসু।
(গ) প্রজাতান্ত্রিক চীনের প্রথম প্রেসিডেণ্ট ছিলেন সান-ইয়াৎ-সেন / ইউ-য়ান-সিকাই।
(ঘ) জাপানের সম্রাটকে বলা হইত মিকাডো/সামুরাই।

একাদশ অধ্যায়

॥ বৃটিশ রাজের অধীনে ভারতবর্ষ ॥

(১৮৫৮–১৯১৪ খ্রীঃ)

নতুন শাসন ব্যবস্থা ঃ সিপাহী বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ ভারতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান হয়। ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন (১৮৫৮ খ্রীঃ)। তিনি দেশবাসীর নিকটে এক ঘোষণায় প্রচার করেন যে, এখন থেকে ভারতবাসী সরাসরি ইংলণ্ডের মহারাণীর প্রজা রূপে গণ্য হবে ; শাসনক্ষেত্রে ভারতবাসী ন্যায্য বিচার পাবে ; কোন দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না ; ভাইসরয়ের মাধ্যমে মহারাণী ভারতের শাসন চালাবেন ইত্যাদি। এই ঘোষণাপত্র ইতিহাসে 'ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র' নামে খ্যাত।



মহারাণী ভিক্টোরিয়া

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে যে নতুন শাসনব্যবস্থা চালু হল তাতে মহারাণী ভারতের শাসিকা হলেন এবং ভারতে শাসন পরিচালনার ভার রইল "ভারত সচিব" নামে তাঁর একজন মন্ত্রীর উপর। ভারত সচিবকে শাসন বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য ১৫ জন সদস্যের একটি সভ্য বা কাউন্সিল গঠিত হল। গভর্ণর জেনারেল লাভ করলেন রাজপ্রতিনিধি বা 'ভাইসরয়' উপাধি। তিনি রাজশক্তির সাক্ষাৎ প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়ালেন ভারতের প্রথম ভাইসরয় নিযুক্ত হলেন লর্ড ক্যানিং।

সাম্রাজ্য বিস্তার ঃ ১৯৬২ সালে লর্ড ক্যানিংয়ের পরে লর্ড এলগিন ভাইসরয় নিযুক্ত হন। তিনি একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ শাসক ছিলেন। তিনি কতিপয় পাঠান উপজাতির শাস্তি বিধানের জন্য একটি অভিযান চালিয়েছিলেন।

স্যার জন লরেন্স ঃ ১৮৬৪ সালে স্যার জন লরেন্স লর্ড এলগিনের স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁর শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ভুটানের

সংগে যুদ্ধে সাফল্য। তিনি ডুয়ার্স অঞ্চলের একটি বৃহৎ অংশ ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন ও ভুটানের রাজাকে বার্ষিক করদানে বাধ্য করেন। লরেন্স ভারতস্থ ইংরেজ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব নিরাপদ করার জন্য একটি বলিষ্ঠ সীমান্ত নীতি অনুসরণ করেন।

লর্ড মেয়ো : ১৮৬৯ সালে লর্ড মেয়ো ভাইসরয় হন। তিনি লরেন্সের নীতি অনুসরণ করে আফগানদের সঙ্গে মৈত্রী বজায় রেখে চলেন। তাঁর নীতির ফলে রাশিয়ার সঙ্গে একটি সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত হয়।

লর্ড নর্থব্রুক : লর্ড মেয়ো আততায়ীর হাতে প্রাণ হারালে (১৮৭২ খ্রীঃ) পরবর্তী ভাইসরয় নিযুক্ত হন লর্ড নর্থব্রুক। তাঁর শাসনকালে রুশ ভীতি প্রবল হয় এবং আফগানদের সংগে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে।

লর্ড লিটন : লর্ড লিটন ১৮৭৮ সালে ভাইসরয় নিযুক্ত হন। তিনি বিশেষভাবে তাঁর সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর শাসনকালে আফগানদের সংগে বিরোধ চরমে ওঠে। তিনি আফগানদের দমনের জন্য পর পর দুটি অভিযান চালান। এর ফলে আফগান শাসক ইংরেজদের বার্ষিক কয়েক লক্ষ টাকা এবং তাঁদের নির্দেশ মত বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করতে বাধ্য হয়। লর্ড লিটনের পরবর্তী ভাইসরয় লর্ড রিপন ও লর্ড ডাফরিনের সময়ে সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে স্থিতিশীল অবস্থা দেখা দেয়। কারণ, সাম্রাজ্য বিস্তারের অগ্রসর নীতির পরিবর্তে তাঁরা অনগ্রসর নীতি অনুসরণ করেন। এরপর লর্ড ল্যান্সডাইন ভাইসরয় হলেন। তাঁর সময়ে আফগানিস্তান ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে সীমানা নির্ধারিত হয়। এই সীমারেখাকে বলে 'ডুরাণ্ড লাইন'।



লর্ড লিটন

লর্ড দ্বিতীয় এলগিন : এরপর ভাইসরয় নিযুক্ত হন লর্ড দ্বিতীয় এলগিন। তাঁর সময়ে চিত্রালকে কেন্দ্র করে সীমান্ত সমস্যা জটিল আকার ধারণ করে।

লর্ড কার্জন : ভাইসরয়দের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হলেন লর্ড কার্জন। তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শাসক। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে আফগানিস্তান, পারস্য এবং তিব্বতে বৃটিশ প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যবাদী শাসন নীতিকে ফলপ্রসূ করার জন্য বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করেন। এইভাবে ভাইসরয়দের প্রচেষ্টার ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটে। লর্ড



লর্ড কার্জন

কার্জনের পর ভারতের ভাইসরয় হলেন দ্বিতীয় লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৯১০)। তাঁর আমলেই ভারত-তিব্বত সীমান্ত নির্ধারিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজ সংস্কার : সুচতুর ইংরাজগণ বুঝেছিলেন যে, ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে গেলে কিছু কিছু সংস্কারমূলক কাজ করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তারা এদেশের সমাজ সংস্কারের কাজে এগিয়ে আসে। তাদের সংস্কারমূলক প্রচেষ্টা-গুলিকে কালগত দিক দিয়ে প্রধানতঃ দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়— (১) ১৮৫৭ সালে পর্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল ও (২) ১৮৫৭ সালের পরবর্তী ভাইসরয়দের আমল।

ভারতীয় সমাজে নানাপ্রকার কুসংস্কার ও কুপ্রথা বহুকাল থেকে বিদ্যমান ছিল। ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অনেক শাসকই ভারতীয় সমাজের কুসংস্কারগুলি দূর করবার চেষ্টা করেন। তাঁদের এই সংস্কারমূলক প্রচেষ্টাগুলিকে সার্থক করতে ভারতীয় যুক্তিবাদী বুদ্ধিজীবীগণ সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। ভারতের সমাজ সংস্কারগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সংস্কার হল বেণ্টিংকের সতীদাহ প্রথা নিবারণ ও ডালহৌসীর বিধবা বিবাহ আইন। এ ব্যাপারে বেণ্টিংককে সমর্থন ও সহযোগিতা করেন রাজা রামমোহন রায় এবং লর্ড ডালহৌসীকে সহযোগিতা করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

সমাজ সংস্কারের সঙ্গে ধর্ম ও শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই সময়ে রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করে ধর্মের ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন এনেছিলেন। পরবর্তীকালে তারই পথ অনুসরণ করে মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হল 'প্রার্থনা সমাজ' এবং স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় 'আর্য সমাজ'। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ব্রাহ্মসমাজ কেশব চন্দ্র সেনের নেতৃত্বে আরও ভালভাবে সংগঠিত হয়। ব্রাহ্মসমাজ, প্রার্থনা সমাজ, আর্যসমাজ—এদের প্রধান কাজ হল বিধবা-বিবাহ প্রচলন করা, বহু-বিবাহ ও বাল্য-বিবাহ দূর করা, আর স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার করা। ভাইসরয় লর্ড রিপন ও লর্ড কার্জনের সহানুভূতিতে এদেশে শিক্ষারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। তাঁদের চেষ্টায় কৃষক ও শ্রমিকদের উন্নতির জন্যও বহু আইন পাশ হয়েছিল।

জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিকাশ : যে কোন জাতীয় চেতনার মূলে থাকে এক মানসিক প্রস্তুতি। ভারতেও জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও জাতীয়তাবাদী মনোভাব বিকাশের মূলে ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব। দু'শ বছরের ইংরেজ শাসনের ফলে ভারতে যে পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল তা ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটায়। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারার প্রভাবে ভারতীয়গণ মধ্যযুগীয় কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করে যুক্তি নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। ফলে ভারতবাসীর জীবনে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দিক থেকে এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। জীবন ধারার এরূপ পরিবর্তন ভারতীয়দের মনে স্বদেশ প্রেম ও স্বাধীনতা স্পৃহার সঞ্চার করে।

উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় আন্দোলন ও সাহিত্যের মাধ্যমে জাতীয় চেতনার প্রসার ঘটে। ভারতের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সর্বপ্রথম এক বিরাট প্রগতিশীল পরিবর্তন ঘটান রাজা রামমোহন রায়। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের মাধ্যমে হিন্দু ধর্ম ও সমাজের সংস্কার করেন। তাঁর আনুকূল্যে ভারতে শিক্ষা ও সংস্কৃতি দ্রুত প্রসার ঘটে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ সনাতন হিন্দুধর্মের নবমূল্যায়ন করেন।

বিবেকানন্দ ছিলেন ঘোর জাতীয়তাবাদী। তিনি ভারতবাসীকে সর্ব প্রকার কাপুরুষতা, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতির উর্ধে এক ধর্মসম্প্রদায়হীন জাতি গঠন করতে আহ্বান জানান। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের এক নতুন মন্ত্র প্রচার করেন।

ভারতের লুপ্তকীর্তির পুনরুদ্ধার হলে ভারতীয়দের মনে এক নতুন আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। প্রাচীন পুঁথি ও পান্ডুলিপি পাঠ করে ভারতীয়গণ দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস জানতে পারে। ফলে নিজেদের মধ্যে সম্বন্ধে হীনমন্যতাবোধ দূর হয় এবং তাদের স্বদেশ প্রীতিবৃদ্ধি পায়।

জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিকাশে সংবাদপত্রের ভূমিকাও ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এদিক থেকে হিকির, বেঙ্গল গেজেট,' মার্শম্যানের 'সমাচার দর্পণ', রামমোহনের 'সংবাদ কৌমুদী' প্রভৃতি ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত সংবাদপত্রের মাধ্যমে বৃটিশ শাসকদের নানাবিধ অন্যায় ও সমাজের কুপ্রথাগুলি কঠোরভাবে সমালোচনা করা হয়।

ইংরেজদের অর্থনৈতিক শোষণের ফলেও ভারতে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। ইংরেজরা এদেশের অর্থ-সম্পদ স্বদেশে প্রেরণ করলে ভারতে আর্থিক অনটন দেখা দেয়। তাছাড়া ইংলন্ডের শিল্পজাত দ্রব্য ভারতে আমদানি হতে থাকলে ভারতের কুটীর শিল্পগুলি ক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে থাকে। এতে দেশে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায় এবং ভারতীয়দের মনে বৃটিশ বিরোধী মনোভাব প্রকট হতে থাকে।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতে সাহায্য করে। এ সময় থেকেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর বিদ্বেষ প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। হাজার হাজার সিপাহীদের আত্মবলিদানের ফলে ভারতবাসীর মনে দেশাত্মবোধের দ্রুত বিকাশ ঘটে। তারা আর ইংরেজদের অত্যাচার নীরবে সহ্য না করে আন্দোলনের পথে পা দেয়। তাই ১৮৫৯-৬০ সালে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের প্রতিবাদে বাংলার কৃষক সম্প্রদায় সঙ্ঘবদ্ধ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত বাঙালীরা এই আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানায়। এইভাবে জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিকাশের দরুণ ভারতবাসীগণ এক ব্যাপক আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হয়।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস : বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের সংঘবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় 'ভারত সভার' অধিবেশনে (১৮৮৩ খ্রীঃ) ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রবল জাতীয় আন্দোলন গড়ে তুলতে সকলকে মিলিত আহ্বান জানান। এর দু' বছর পরেই ১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম নামে একজন অবসর প্রাপ্ত সিভিলিয়ান। তাই তাঁকে ভারতীয় 'জাতীয় কংগ্রেসের জনক' বলা হয়। তিনি ভারতের নবজাগ্রত জাতীয় চেতনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। বৃটিশ



বিরোধী বিক্ষোভ যাতে হিংসাত্মক পথে না গিয়ে নিয়মতান্ত্রিক পথে চলতে পারে তার জন্য তিনি একটি জাতীয় দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাই ১৮৮৩ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন স্নাতকদের উদ্দেশ্যে অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম একখানি খোলা চিঠি লেখেন। এতে তিনি একটি সর্বভারতীয় প্রতিনিধিমূলক সংগঠন গড়ে তুলবার আহ্বান জানান। এ ব্যাপারে তিনি ভারতের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সমর্থন লাভ করেন। এমন কি ভারতের বড়লাট লর্ড ডাফরিন এই প্রস্তাবকে প্রাথমিক সমর্থন জানান।



উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৮৫ সালে বোম্বাই নগরীতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ৭২ জন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করেন। বাংলার ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি হন। এ সময় থেকেই প্রতি বছর ভারতের বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেসের অধিবেশন চলতে থাকে। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে কলকাতায় এবং তৃতীয় অধিবেশন বসে মাদ্রাজে।

প্রথমদিকে জাতীয় কংগ্রেসের সভ্যবৃন্দ ইংরেজদের বিরোধিতা করতে চান নি। তাঁরা আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে ইংরেজ শাসকদের সহযোগিতায় ভারতের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে উদ্যোগী হন। তাই প্রথম অবস্থায় কংগ্রেসের প্রতি ইংরাজ সরকারের মনোভাব ছিল সহানুভূতি সম্পন্ন। কিন্তু কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা ও শক্তি বৃদ্ধিতে ইংরেজ সরকার শঙ্কিত হলেন এবং কংগ্রেসের উপর বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে থাকেন। এদিকে কংগ্রেসের সদস্যগণ দেখলেন যে, তাঁদের আবেদন-নিবেদন ব্যর্থ—ইংরেজ সরকার তাঁদের দাবির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। ফলে শাসকবর্গের প্রতি কংগ্রেসীদের মনোভাব ক্রমেই কঠোর হতে থাকে। কংগ্রেস দলের একাংশের মনে হয়, অনুনয় বিনয় করে ইংরেজদের কাছ থেকে কোন অধিকার পাওয়া যাবে না—অধিকার আদায় করে নিতে হবে। এর ফলে কংগ্রেসের মধ্যে নরমপন্থী ও চরমপন্থী নামে দুটি দলের সৃষ্টি হল। যাঁরা আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে ইংরেজ সরকারের নিকট থেকে দাবী আদায়ের পক্ষপাতী ছিলেন তাঁরা 'নরমপন্থী' নামে পরিচিত। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দাদাভাই নৌরজী, গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রভৃতিরা ছিলেন নরমপন্থীর সমর্থক। আর যাঁরা আবেদন-নিবেদন নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না, সক্রিয় আন্দোলনের মাধ্যমে দাবী আদায়ের পক্ষপাতী ছিলেন তাঁরা 'চরমপন্থী'। বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতিরা ছিলেন চরমপন্থী।

১৮৯২ সালে বড়লাট ল্যান্স ডাউনের কাউন্সিল অ্যাক্টকে কেন্দ্র করে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধের কোন মীমাংসা না হওয়ায় ১৯০৭ সালে সুরাট অধিবেশনে চরমপন্থী নেতাগণ কংগ্রেস ত্যাগ করেন।

চরমপন্থী আন্দোলন : চরমপন্থায় বিশ্বাসী চারজন উল্লেখযোগ্য জননেতা হলেন বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ, মহারাষ্ট্রের

বাল গঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়। তাঁদের চেষ্টায় ভারতে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটে।

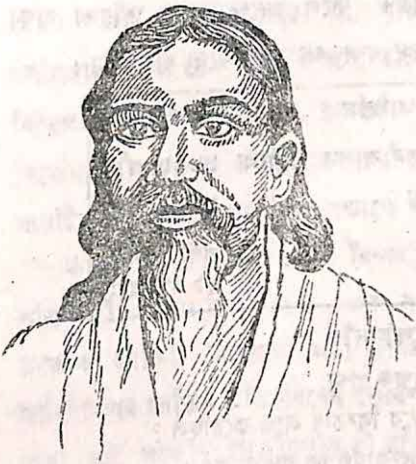
বাংলাদেশ হল বিপ্লবের পীঠস্থান। এই বংলাদেশে উগ্র জাতীয়তাবাদ বিস্তারে বিপিনচন্দ্র পাল এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের বরনীয় নেতা বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন প্রসিদ্ধ বাগ্মী, কৃতি সাংবাদিক এবং সুলেখক। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা করলে তার বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। প্রথম 'নিউ ইণ্ডিয়া' পরে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় তিনি নির্ভীকভাবে তাঁর রাজনৈতিক মত প্রচার করেন। তাঁর বক্তৃতায় ও জ্বলন্ত দেশপ্রেমে বাংলার তরুণ সমাজ উদ্দীপিত হয়েছিল। মাণিকতলার বোমার মামলায় অরবিন্দের বিরুদ্ধে বিপিন পালকে রাজসাক্ষী হতে বলা হয়। ইংরেজ সরকারের এই আদেশ তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। সেজন্য তাঁকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।



বিপিনচন্দ্র পাল

ভারতবর্ষের রাজনীতিতে অরবিন্দ ঘোষের আবির্ভাব একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়া স্বত্বেও বৃটিশরাজ তাঁকে আই-সি-এস এর পদ থেকে বঞ্চিত করেন। পরে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে এসে বরোদা কলেজ অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। বরোদায় অবস্থানকালে মহারাষ্ট্রের বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে তিনি বরোদা থেকে কলকাতায় আসেন। তিনি জাতীয় কলেজে খুব সামান্য বেতন অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। তাঁর নেতৃত্বে বিভিন্ন বিপ্লবী গুপ্ত সমিতিগুলি

ঐক্যবদ্ধ হয়। ১৯০৬ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত ভারতের রাজনীতিতে বিশিষ্ট চরমপন্থী নেতারূপে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বিখ্যাত মাণিকতলার বোমার মামলায় তিনি কারারুদ্ধ হন। কিন্তু ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাসের অপূর্ব সওয়ালের ফলে তিনি মুক্তিলাভ করেন।


অরবিন্দ ঘোষ


বাল গঙ্গাধর তিলক

মহারাষ্ট্রের উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সফল ও সার্থক করে তুলেছিলেন চরমপন্থী মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা বাল গঙ্গাধর তিলক। তাঁর সম্পাদিত 'মারহাট্টা' ও 'কেশরী' পত্রিকায় তিনি দেশাত্মবোধক প্রবন্ধ প্রকাশ করতেন। তিনি মনে করতেন, স্বরাজ প্রত্যেক ভারতবাসীর জন্মসূত্রে লব্ধ অধিকার। স্বদেশী ভাবধারারও তিনি অন্যতম পথদ্রষ্টা। স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ ও বিদেশী দ্রব্য বর্জন বা বয়কট আন্দোলনের প্রতি তাঁর গভীর সমর্থন ছিল।


লালা লাজপত রায়

বাংলা ও মহারাষ্ট্রের মত পাঞ্জাবে যিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রসার ঘটান তিনি হলেন পাঞ্জাবের অবিসংবাদী নেতা লালা লাজপত রায়। তিনি ছিলেন নির্ভীক ও স্বদেশপ্রেমিক জননেতা। দেশের জন্য সর্বপ্রকার দুঃখ-কষ্টকে তিনি অকাতরে হাসিমুখে বরণ করে নিতে পারতেন। বাংলাদেশের স্বদেশী

আন্দোলনের একজন ঘনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন তিনি। পাঞ্জাবের তরুণ সমাজ তাঁরই প্রেরণায় উদ্দীপিত হয়ে স্বদেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের সংগ্রামী আন্দোলনের ফলে সারা দেশে বৃটিশ বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে। বয়কট, স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয়গণ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। ফলে আন্দোলনের তীব্রতা লক্ষ্য করে ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হন।

কালক্রম	
মহারাণীর ঘোষণা ও নতুন শাসন ব্যবস্থা	১৮৫৮ খ্রীঃ
জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা	১৮৮৫ খ্রীঃ
বঙ্গভঙ্গ	১৯০৫ খ্রীঃ
বঙ্গভঙ্গ রদ	১৯১১ খ্রীঃ

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তার লাভ করেছিল ?
২। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সংস্কারগুলি বর্ণনা কর।
৩। ভারতে কিভাবে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটিয়াছিল ?
৪। ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে কি জান ?
৫। ১৯০৫-১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চরমপন্থী আন্দোলনের কর্মধারা বিবৃত কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। লর্ড বেণ্টিঙ্ক ও রিপনের সমাজ সংস্কারগুলি উল্লেখ কর।
২। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম তিনটি অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৩। 'নরমপন্থী' ও 'চরমপন্থী' বলতে কি বোঝ ?
৪। চরমপন্থী আন্দোলনে অরবিন্দ ঘোষের অবাদান বর্ণনা কর।
৫। লালা লাজপত রায়ের চরমপন্থী কর্মপন্থীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ
(ক) ভারতের প্রথম ভাইসরয় ছিলেন———।
(খ) সতীদাহ প্রথা নিবারণ করেন লর্ড———।
(গ) জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়———খ্রীষ্টাব্দে।
(ঘ) ———কে 'জাতীয় কংগ্রেসের জনক' বলা হয়।
(ঙ) জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন———।

দ্বাদশ অধ্যায়

॥ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের একটি বিভীষিকাময় ঘটনা হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। বিধাতার অভিশাপের মত পৃথিবীর বুকে এই যুদ্ধ দেখা দেয়। এই যুদ্ধে বিশ্বের সব শক্তিমান দেশ জড়িয়ে পড়ে। এর লেলিহান শিখা যেন সারা বিশ্বকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলির সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। এতবড় একটি প্রলয়ংকরী বিশ্বযুদ্ধ কোন একটিমাত্র কারণে সংঘটিত হতে পারে না। এর পশ্চাতে বহু ঘটনা বা কারণ লক্ষ্য করা যায়।

কারণ :—প্রথমতঃ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ইউরোপের বিভিন্ন শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এক সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ দেখা যায়। প্রত্যেক জাতিই নিজেকে অন্য জাতি থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করত এবং এক জাতি অপর জাতির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী মনোভাব এক সময় যুদ্ধের পটভূমিকা রচনা করে।

দ্বিতীয়তঃ, শিল্পের দ্রুত উন্নতির সংগে সংগে শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে এবং কাঁচামাল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এক ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স আফ্রিকা এবং এশিয়ার অধিকাংশ দেশেই তাদের উপনিবেশ স্থাপন করে। জার্মানিতে শিল্প বিপ্লব দেরীতে হওয়ায় জার্মানী ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতায় নামে অনেক দেরীতে। শিল্প বিপ্লবের ফলে যখন জার্মানির শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেল তখন জার্মানির উপনিবেশ দখল করার জন্য উদ্যোগী হল। এর ফলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সংগে জার্মানির বিরোধ বাধল।

তৃতীয়তঃ, শিল্পের উন্নতির সংগে সংগে বিভিন্ন দেশে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। সর্বত্র কামান, গোলা, বারুদ ইত্যাদি নির্মাণ হতে লাগল। অস্ত্রের প্রাচুর্য মানুষের মধ্যে যুদ্ধের মনোবৃত্তি সৃষ্টি করল।

চতুর্থতঃ, প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য জার্মানির কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের আগ্রাসী নীতি বিশেষভাবে দায়ী ছিল। দ্বিতীয় উইলিয়ম বিশ্ব রাজনীতিতে জার্মানীর প্রাধান্য স্থাপন করার জন্য মনে মনে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। তাঁরই ঈঙ্গিতের ফলে জার্মানির সঙ্গে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। তাঁরই প্রচেষ্টায় জার্মানির নৌ-শক্তি বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় উইলিয়মের নেতৃত্বে জার্মানির শক্তিবৃদ্ধিকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া—ইউরোপের এই তিনটি রাষ্ট্র প্রসন্ন মনে গ্রহণ করল না। ফলে তারা 'ত্রি-শক্তি আঁতাত' গঠন করল। পূর্বেই বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মানি, ইতালি ও অষ্ট্রিয়া এই তিন শক্তি নিয়ে এক 'ত্রি-শক্তি চুক্তি' গঠিত হয়েছিল। এই ত্রি-শক্তি চুক্তি ও ত্রি-শক্তি আঁতাত গঠিত হওয়ায় ইউরোপে দুটি বিবাদমান গোষ্ঠীর সৃষ্টি হল। উভয় গোষ্ঠীই ইউরোপে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য সমর সজ্জায় সজ্জিত হতে লাগল। সমগ্র ইউরোপ যেন এক বারুদ স্তূপে পরিণত হল।

ইউরোপে যখন এরূপ অনিশ্চিত অবস্থা ঠিক তখনই একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সর্বগ্রাসী মহাযুদ্ধের সূচনা হ'ল। এই ঘটনাটির মূলে ছিল অষ্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার দ্বন্দ্ব। বোসনিয়া ও হারজেগোভিনা নামে দুটি স্লাভ জাতি অধ্যুষিত রাজ্যকে সার্বিয়া নিজ দেশের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চেয়েছিল। কারণ সার্বিয়াও ছিল স্লাভ জাতি অধ্যুষিত একটি দেশ। কিন্তু অষ্ট্রিয়া বোসনিয়া ও হারজেগোভিনা রাজ্য দুটি অধিকার করে নিলে সার্বিয়া স্বভাবতই ক্ষিপ্ত হয়। ফলে অষ্ট্রিয়া অধিকৃত অঞ্চলের স্লাভদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হলে সার্বিয়া তাকে সমর্থন করে। বোসনিয়া ও হারজেগোভিনায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চলার সময়ে অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের ভাইপো ও সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আর্কডিউক ফ্রান্সিস ফার্ডিনাণ্ড সস্ত্রীক বোসনিয়ার রাজধানী সেরাজেভোতে বেড়াতে যান। সেখানে তিনি এক বিপ্লবীর আক্রমণে নিহত হন (১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে জুন)। অষ্ট্রিয়া সরকার এই ঘটনার পশ্চাতে সার্বিয়ার হাত আছে মনে করে সার্বিয়াকে এক চরম পত্র দেন। এতে কতকগুলি শর্ত ছিল। সার্বিয়া সেই চরমপত্রের মাত্র কয়েকটি শর্ত মানতে অস্বীকার

করলে অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড আক্রমণ করল। এইভাবে সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ডকে উপলক্ষ্য করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল (২৮শে জুলাই, ১৯১৪)।

ব্যাপকতা—প্রথমে রাশিয়া সার্বিয়ার পাশে দাঁড়ায়। এরপরে একে একে ইংরেজ, ফরাসী, পর্তুগাল, আমেরিকা প্রভৃতি দেশও এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে অস্ট্রিয়ার পক্ষে দাঁড়ায় জার্মানি, ইটালী, তুরস্ক প্রভৃতি দেশ। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ চার বছর এই যুদ্ধ চলেছিলে। এই যুদ্ধে বিমান, ডুবো জাহাজ, কামান, বন্দুক, ট্যাংক ও নানা রকমের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল। শুধু তাই নয় শত্রুপক্ষ নিধন করার জন্য বিষাক্ত ও মারাত্মক গ্যাস পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়েছিল। ব্যাপকতা ও ভয়াবহতার দিক থেকে এইরকম একটি যুদ্ধ অভূতপূর্ব।

ফলাফল ঃ—এই যুদ্ধের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অজস্র নরনারী প্রাণ হারিয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেয় ১ কোটি ৩০ লক্ষ সৈনিক, আহত হয় ২ কোটি ১০ লক্ষ, পঙ্গু হয়ে যায় প্রায় ৭০ লক্ষ। অসামরিক লোকের হতাহতের সংখ্যা আরও অনেক বেশী। বাড়ীঘর ও সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় ২৭ হাজার কোটি ডলার। এই যুদ্ধে জার্মানি প্রায় একক শক্তিতেই প্রবল আঘাত হেনেছিল।

যুদ্ধের প্রথম দিকে আংশিক সাফল্য লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত কিন্তু এর ফলাফল হয়েছিল খুবই মর্মান্তিক। এই যুদ্ধে জার্মানি ও তার মিত্রশক্তির শোচনীয় পরাজয় ঘটে। জার্মানি অপমানজনক একটি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই অপমানের জ্বালা জার্মানির পক্ষে বিস্মৃত হওয়া ছিল খুবই কঠিন। তাই এই যুদ্ধের ত্রিশ বছর পার হতে না হতেই আরও একটি বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

এই যুদ্ধের ফলে ইউরোপের কয়েকটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের বিলোপ ঘটে এবং সেখানে গড়ে ওঠে অসংখ্য ছোট ছোট নতুন রাষ্ট্র। ঐ নবগঠিত রাষ্ট্রগুলিতে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটতে থাকে।

যুদ্ধের ধ্বংসলীলা মানুষের মনকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। মানুষ

আর যুদ্ধ চায় না। তারা শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে উদ্যোগী হল। এর ফলেই গঠিত হল জাতি-সংঘ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংলণ্ডকে ভারতবর্ষের সাহায্যদানের কারণ

১৯১৪ সালের ২৮ শে জুলাই গোটা ইউরোপ জুড়ে শুরু হয় প্রথম মহাযুদ্ধ। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ তখন ইংলণ্ডের পদানত, পরাধীনতার অক্টোপাশ বন্ধনে আবদ্ধ। এই যুদ্ধে ভারতবর্ষের কোন রকম স্বার্থ জড়িত ছিল না, তথাপি ইংলণ্ডের স্বার্থে ভারতকে এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হোল। সেই সময় ভারত ছিল ইংলণ্ডের প্রধান শক্তির উৎস। তাই ইংলণ্ড চেয়েছিল যে, ভারতীয় জনগণ সর্বতোভাবে ইংলণ্ডকে সমর্থন ও সক্রিয় সাহায্য করুক এবং সবরকম বৃটিশ বিরোধী কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকুক। প্রতিদানে ইংরেজ সরকার যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারলে ভারতবাসীকে তাদের বহু আকাঙ্খিত স্বায়ত্বশাসন দান করবে। যুদ্ধান্তিক এই পুরস্কারের প্রলোভনে সেদিন ভারতবর্ষের অনেক নরমপন্থী-চরমপন্থী রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ইংলণ্ডকে সমর্থন জানিয়েছিলেন, তার জয়লাভ কামনা করেছিলেন এবং লোকবল ও অর্থবল দিয়ে ইংরেজদেরকে সর্বতোভাবে সাহায্যদান করার জন্য দেশবাসীর উদ্দেশ্যে উদার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এমনকি প্রখ্যাত চরমপন্থী নেতা এবং ইংরেজদের প্রবল শত্রু মহারাষ্ট্রের লোকমান্য তিলক মহাযুদ্ধ শুরু হবার একমাস পরেই পুনা থেকে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত "মারহাট্টা" পত্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখলেন : ইংরেজদের এই বিপদে ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র সকল ভারতীয়েরই কর্তব্য হোল যথাসাধ্য ইংরেজদেরকে সাহায্য করা এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী তখন সবেমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে ফিরে এসেছেন (১৯১৫)। তিনিও ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগকে ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গলজনক বলে মনে করলেন। ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিয়েই তিনি প্রবল উৎসাহের সঙ্গে ইংরেজদের হ'য়ে সৈন্য সংগ্রহে লেগে গেলেন। দেশবাসীকে বললেন বৃটিশ সরকারের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য জানাতে। ভারতীয় জাতীয়

কংগ্রেসের যুদ্ধকালীন বার্ষিক অধিবেশনগুলিতেও শোনা গেল সেই সুর। শুধু জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দই নয়, মুসলিম লীগের নেতারাও যুদ্ধকালে ইংরেজদের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা করতে মুসলিম জনগণকে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

যুদ্ধকালীন অর্থসঙ্কট ও জনগণের অসন্তোষ : বিশ্বযুদ্ধে ভারতবাসী বৃটিশ পক্ষকে নানাভাবে সাহায্য ও সমর্থন করে বটে, কিন্তু এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে তাদের ভয়ানক অর্থ সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। দীর্ঘ চার বছর যুদ্ধ চলার ফলে দ্রব্যমূল্য অত্যাধিক বৃদ্ধি পায়। নিত্য ব্যবহৃত জিনিসের মূল্য অত্যাধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ লোকের কষ্টের সীমা থাকে না। এদিকে যুদ্ধের সুযোগে কালোবাজারী ও মুনাফা শিকারীরা খাদ্য দ্রব্য মজুত করে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটায়। দেশে খাদ্যাভাব ঘটিয়ে তারা প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে থাকে। দেশের অনেক লোক অর্দ্ধাহারে ও অনাহারে দিন কাটাতে লাগল। এদিকে বিশ্বযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে বহু সৈনিকের মৃত্যু হয় এবং তাদের পরিবারে আর রোজগারী মানুষ না থাকায় ঐ পরিবারগুলি নিদারুণ অর্থ কষ্টের মধ্যে দিন কাটাতে শুরু করে। অর্থসংকট ও খাদ্যাভাব দেখা দিলে মানুষ অখাদ্য-কুখাদ্য খেতে শুরু করে। ফলে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। তাতে বহু লোক মারা যায়।

এরূপ অবস্থায় একদিকে কালোবাজারীদের দৌরাত্ম অপর দিকে ইংরেজ সরকারের উদাসীন মনোভাব ভারতীয়দের অসন্তুষ্ট করে। বৃটিশ সরকারকে বিপদে সাহায্য করেও তারা বৃটিশ-সাহায্য থেকে যে বঞ্চিত—একথা তারা বুঝতে পারে। ফলে ক্ষুব্ধ ভারতবাসীরা এই সময় বৃটিশ বিরোধী কার্যে লিপ্ত হতে থাকে।

ভারতে ও বহির্ভারতে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশ সরকারকে ভারতের সকল দল ও নেতা যে সমর্থন জানিয়েছিল তা নয়, ভারতেরই একদল বিপ্লববাদী নেতা বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে বিপন্ন বৃটিশ সরকারকে চরম আঘাত হানতে চেয়েছিলেন। ইংরেজ সরকার তাঁদেরকে 'টেররিস্ট' আখ্যা দিয়ে নস্যাৎ করতে চাইলেও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা

আন্দোলনের ইতিহাসে কিন্তু তাঁরা আপন মহিমায় ভাস্বর হ'য়ে আছেন। আবেদন-নিবেদন নয়, এমন কি আপোষ-মীমাংসা নয়, ভারতীয় এই বিপ্লবীরা চেয়েছিলেন ইংরেজদের এদেশের মাটি থেকে উৎখাৎ করে স্বাধীনতার জন্মগত অধিকারকে রক্ত দিয়ে অর্জন করে নিতে। তাই বিশ্বযুদ্ধের মত একটা সুবর্ণসুযোগ যখন এল তখন তাঁরা চাইলেন তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে। সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী এক বিরাট অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা তাঁদের মাথায় এল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাঁরা জার্মানির সাহায্য ও সহানুভূতি আদায় করতে তৎপর হ'লেন। জার্মানিও ভারতীয় বিপ্লবীদের এই ইংরেজ বিরোধিতাকে আপন স্বার্থে ব্যবহার করতে চাইল। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, বরকতুল্লা, ওবেদুল্লা সিন্ধী প্রভৃতিরা জার্মানির সহায়তায় ইংরেজ রাজত্ব উচ্ছেদের স্বপ্ন দেখলেন, এমন কি "অস্থায়ী ভারত সরকার" পর্যন্ত ঘোষণা করলেন। বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে ১৯১৩ সালে লালা হরদয়ালের নেতৃত্বে আমেরিকা প্রবাসী ভারতীয় শ্রমিক ও ছাত্রদের নিয়ে গদর পার্টি স্থাপিত হয়। 'গদর' শব্দের অর্থ বিপ্লব। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় গদর পার্টি ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে ভারতে বিপ্লব ঘটাবার এক পরিকল্পনা করে। এই উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে প্রচুর অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র আনবারও পরিকল্পনা হয়। কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সুযোগে বাংলাদেশেও বিপ্লবী কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ১৯১৫ সালে জার্মানির সাহায্যে আমেরিকা থেকে যবদ্বীপ মারফৎ অস্ত্রশস্ত্র আনিয়ে সুন্দরবন এলাকার মধ্য দিয়ে কলিকাতা, নোয়াখালির হাতিয়া আর উড়িষ্যার বালেশ্বরে পাঠানোর পরিকল্পনা হয়েছিল। কিন্তু আগে ভাগেই পুলিশ এই বিপ্লবের প্রস্তুতির কথা জানতে পারায় সব আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যায়। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে বালেশ্বরের কাছে বিপ্লবীদের এক গোপন কেন্দ্রে পুলিশ হানা দেয়। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাযতীন) নেতৃত্বে বিপ্লবীরা তাদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর উড়িষ্যার বালেশ্বরে বুড়ি-বালাম নদীর তীরে বাংলাদেশের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টের

নেতৃত্বে ইংরেজ পুলিশদের সঙ্গে বিপ্লবী যুবক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর চারজন তরুণ সংগীর সম্মুখ যুদ্ধ হয়। যতীন্দ্রনাথ বীরোচিত সংগ্রাম করে সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দেন। তাঁর এই দুর্জয় সাহস ও অতুলনীয় বীরত্বের জন্য তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

স্বনামধন্য বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু এই সময় ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের এক অপূর্ব সুযোগ দেখতে পেলেন। তিনি ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বৃটিশের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানের কথা প্রচার করেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্যে সারা দেশ জুড়ে তিনি সশস্ত্র-অভ্যুত্থানের এক পরিকল্পনা করেন। স্থির হয়, ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী এক বিরাট অভ্যুত্থান ঘটানো হ'বে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে উৎখাত করার জন্য। পরিকল্পিত ২১শে ফেব্রুয়ারী অভ্যুত্থানের কথা গোপন রইল না শেষ পর্যন্ত। কৃপাল সিং নামে বিপ্লবীদের একজন বিশ্বাসঘাতক সমগ্র পরিকল্পনার কথা ফাঁস করে দেয় ইংরেজ গোয়েন্দাদের কাছে। ফলে বহু বিপ্লবী ধরা পড়েন। শুরু হয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা। রাসবিহারী বসু পি, এন ঠাকুর ছদ্মনামে ভারত ত্যাগ করে জাপানে চলে যান। এবং সেইখান থেকেই ভারতের মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যান জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।



রাসবিহারী বসু

হোমরুল আন্দোলন ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সুরু হ'লে বৃটিশ সরকার যখন ভারতবাসীর কাছে সব রকমের সমর্থন ও সক্রিয় সাহায্যের আবেদন জানালেন তখন অ্যানি বেসান্ত নামে এক বিদেশিনী মাদ্রাজের আদিয়ার থেকে প্রকাশিত তাঁর 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় দাবী জানালেন ঃ "বৃটেনের এই দুর্দিনে ভারতবর্ষের সাহায্য হবে শর্তাধীন ; আর সেই শর্ত হোল— ভারতবাসীকে হোমরুল বা স্বায়ত্বশাসনের অধিকার প্রদান।" শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে এসে থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে

যোগদান করেন। দীর্ঘকাল থিওসফি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত শ্রীমতী বেসান্ত বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে ভারতীয় রাজনীতির আঙিনায় প্রথম প্রবেশ করেন এবং বিশ্বযুদ্ধের সুযোগকে মূলধন করে বৃটিশের কাছে দাবী জানান ভারতবর্ষের জন্য হোমরুল বা স্বায়ত্বশাসনের অধিকার। মহারাষ্ট্রের চরমপন্থী নেতা বাল গঙ্গাধর তিলক ছিলেন হোমরুল আন্দোলনের অপর এক নেতা। এই আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের নির্বাচিত এক দায়িত্বশীল সরকার গঠন করাই ছিল তাঁরও অ্যানি বেসান্তের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু নরমপন্থী কংগ্রেসীগণের কাছে এই আদর্শ মনঃপূত হয় নি। ফলে তিলক নিজে ১৯১৬ সালের ২৮শে এপ্রিল মহারাষ্ট্রে একটি হোমরুল লীগ এবং অ্যানি বেসান্ত ১৯১৬ সালের ৩রা সেপ্টেম্বরে মাদ্রাজে একটি হোমরুল লীগ স্থাপন করে তাঁদের আন্দোলন চালাতে থাকেন।

অ্যানি বেসান্ত এবং তিলকের যৌথ নেতৃত্বে হোমরুল আন্দোলন শীঘ্রই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে হোমরুল লীগের শাখা স্থাপিত হয় এবং হোমরুল আন্দোলন সর্বভারতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়। অ্যানি বেসান্ত মাদ্রাজের আদিয়ার থেকে প্রকাশিত তাঁর নিউ ইণ্ডিয়া কমনওয়েল পত্রিকার মাধ্যমে এবং লোকমান্য তিলক মহারাষ্ট্রের পুনা থেকে প্রকাশিত তাঁর 'মারহাট্টা' ও 'কেশরী' পত্রিকার মাধ্যমে হোমরুলের স্বপক্ষে প্রচার চালাতে থাকেন। হোমরুল আন্দোলনের জনপ্রিয়তা ও ব্যাপক প্রসার বৃটিশ সরকারের অস্বস্তির কারণ হ'য়ে ওঠে। ফলে তিলক ও অ্যানি বেসান্ত উভয়ের উপরেই সরকারের খড়্গহস্ত নেমে আসে। তিলককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। তিলক কিন্তু জরিমানা দিতে অসম্মত হন। অপরদিকে অ্যানি বেসান্তকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁর 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকাকে বাজেয়াপ্ত করার আদেশ জারী করা হয়। ফলে দেশের সর্বত্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় এবং তাতে বেসান্তের মুক্তি ও হোমরুলের দাবী জোরদার হয়। এককথায় তিলক ও বেসান্তের প্রতি বৃটিশ সরকারের দমনমূলক নীতি হোমরুল আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী, আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছিল।

লক্ষ্ণৌ চুক্তি। ভারতীয় রাজনীতিতে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের দুটি উল্লেখ

যোগ্য ঘটনা হোল—কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের বিবাদের অবসান এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে লক্ষ্মৌ-চুক্তি স্বাক্ষর। ১৯০৭ সালে 'সুরাট বিচ্ছেদে'র দীর্ঘ নয় বছর পরে আবার দুই কংগ্রেসের পুণর্মিলন ঘটল। অ্যানি বেসান্তের ঐকান্তিক প্রয়াস এবং হোমরুল আন্দোলনের জনপ্রিয়তার ফলেই এই মিলন সম্ভবপর হয়েছিল।

ইতিমধ্যে মুসলিম লীগও সংগ্রামী হয়ে ওঠে। ইসলাম জগতের ধর্মগুরু তুরস্কের খলিফার স্বার্থবিরোধী বৃটিশ নীতি ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়কে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও মহম্মদ আলি কর্তৃক সম্পাদিত 'আল্ হিলাল' এবং 'কমরেড' নামে দুটি পত্রিকা ইংরেজ সরকার বন্ধ করে দেন এবং বহু জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতাকে নজরবন্দী করে রাখেন। ফলে মুসলমান সম্প্রদায় আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং লীগের নেতৃবৃন্দ জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বৃটিশের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলন চালাবার প্রয়োজন উপলব্ধি করে। এই বিষয়ে আগ্রহী হন মহম্মদ আলী জিন্না। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় দলেরই বার্ষিক অধিবেশন লক্ষ্মৌ শহরে অনুষ্ঠিত হয়। নরমপন্থী নেতারা তিলক ও মিসেস বেসান্তের হোমরুলের দাবী সমর্থন করেন। ফলে দীর্ঘকাল পরে দুই কংগ্রেসের মিলন হয়। মুসলমান নেতৃবৃন্দও হোমরুলের দাবী সমর্থন করে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের নিদর্শন স্বরূপ বিপিনচন্দ্র পাল মুসলিম লীগের অধিবেশনে উপস্থিত থাকেন ও বক্তৃতা দেন। এইভাবে হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে লক্ষ্মৌতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে যে চুক্তি হয়, তা 'লক্ষ্মৌ চুক্তি' নামে খ্যাত। লক্ষ্মৌতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অধিবেশন ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

রাউলাট আইন : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ভারতবাসীর দুর্দশার সীমা ছিল না। কেবল যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল তা নয়, নানা রকম করভারেও তারা জর্জরিত হয়েছিল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে যে মহামারী দেখা দিয়েছিল, তাতে প্রায় দেড় কোটির মত লোক মারা গিয়েছিল। দেশে কেবল বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণী নয়, কৃষক-শ্রমিক

শ্রেণীও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। দেশের এই দুর্দশার মূলে যে বৃটিশ শাসকরা রয়েছে, একথা বুঝতে কারো বাকী রইল না। ফলে বৃটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের সকল শ্রেণীর মধ্যেই বিক্ষোভ ও ক্রোধ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল। এ সময়ে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট যখন ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষাকে পরিহাস করে প্রকাশিত হল, তখন ভারতবাসীর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। বৃটিশ সরকার ১৯১৯ খ্রীঃ 'রাউলাট অ্যাক্ট' নামে এক দমনমূলক আইন পাশ করে সমগ্র পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে চাইলেন। এই আইনের বলে ভারতবাসীর ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে কঠোর বিধিনিষেধের বেড়াজালে বেঁধে ফেলা হল। বিচারপতি রাউলাটের নেতৃত্বে গঠিত এক কমিটি এই দমনমূলক আইনের সুপারিশ করেছিলেন বলে এই আইনের নাম 'রাউলাট অ্যাক্ট'। এই আইনে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা অথবা কোন বিপ্লবীকে নজরবন্দী রাখা এবং নাগরিক অধিকার সংকুচিত করার নীতি গৃহীত হয়।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডঃ রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশবাসী সোচ্চার হ'য়ে ওঠে। অসন্তোষের আগুন জ্বলে ওঠে দেশের সর্বত্র। রাউলাট আইন বিরোধী এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তাঁর আহ্বানে দেশের সর্বত্র হরতাল পালিত হয় এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ প্রদর্শন, প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বৃটিশ সরকার কঠোর দমন নীতির সাহায্যে এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে চাইলেন। বহু দেশবাসী হতাহত হোল সভা, শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করার অপরাধে। কিন্তু দমননীতির সবচেয়ে বীভৎস এবং নগ্নরূপ দেখা গেল পাঞ্জাবের অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে। ১৯১৯ সালে ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে হাজার হাজার নিরস্ত্র মানুষ এক প্রতিবাদ সভায় সমবেত হয়। চারিদিকে ঘেরা ঐ বাগ বা উদ্যানে প্রবেশ করবার এবং বাইরে আসবার একটি মাত্রই পথ ছিল। বৃটিশ জেনারেল ডায়ার পাঞ্জাবকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে চাইলেন। তাই তাঁর নির্দেশে প্রতিবাদ সভায় সমবেত নিরস্ত্র জনতার উপর অবিশ্রান্ত পুলিশের গুলিবর্ষণ শুরু হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগে

রক্তগঙ্গা বয়ে যায়। শত শত লোক নিহত ও আহত হয়। এরপর সারা পাঞ্জাব জুড়ে চলে চরম নির্যাতন। নৃশংস সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন ক্রূরতার মর্মন্তুদ পরিচয় পেয়ে সারা দেশ শিউরে ওঠে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সেদিন এই নৃশংস বর্বরতার প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন। ভারতবর্ষের সমগ্র মানুষ ঘৃণায় ও রোষে হতবাক হয়ে যায়।

মণ্ট-ফোর্ড সংস্কার : মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং সন্ত্রাসবাদীগণের বৃটিশ সরকার বিরোধী মনোভাব সত্ত্বেও ভারতবর্ষ বৃটিশ সরকারকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অর্থ ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিল। ভারতবাসীগণের এই সহযোগিতার প্রতিদানে বৃটিশ সরকার ভারতকে দায়িত্বশীল স্বায়ত্তশাসন দেবে, এ রকম আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের শেষে ইংরেজ সরকার সেরকম কিছুই করলেন না। ফলে স্বভাবতই ভারতবাসীর মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ল। চতুর ইংরেজ-সরকার ভারতবাসীকে শান্ত করবার জন্য কিছু শাসন সংস্কার করতে চাইলেন। এই সময় ভারত সচিব ছিলেন মণ্টেগু এবং বড়লাট ছিলেন লর্ড চেমস্-ফোর্ড। তাঁরা শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব করে যে রিপোর্ট দিলেন তা 'মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড রিপোর্ট' নামে পরিচিত। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ঐ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। নরমপন্থীরা এই সংস্কারকে স্বাগত জানালেও, চরমপন্থীরা বর্জন করে। অ্যানি বেসান্ত এই সংস্কারকে 'দাসত্বের পরিকল্পনা' বলে ঘোষণা করেন। অনেকে 'তুচ্ছ, বিরক্তিকর ও নৈরাশ্যজনক' বলে এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন। কিন্তু তবুও ভারতীয় জনমতকে উপেক্ষা করে ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী একটি শাসন সংস্কার ভারতের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হল।

বৃটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের 'ভারত শাসন আইন' পাস হয়। এই আইন অনুসারে প্রবর্তিত শাসন সংস্কার 'মণ্ট-ফোর্ড সংস্কার' নামে পরিচিত হয়। ১৯১৯-এর ভারত শাসন আইনের দ্বারা ভারতীয় প্রতিনিধিদের উপর কিছু শাসন-দায়িত্ব অর্পিত হলেও এই সংস্কারের দ্বারা প্রকৃত দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার কোন ব্যবস্থা হয় নি।

মুসলমান সম্প্রদায়ের অসন্তোষ : বৃটিশ শাসন ভারতবর্ষের মুসলমান

সম্প্রদায়কেও সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। ফলে মুসলমানগণ বৃটিশ তোষণের নীতি ত্যাগ করে নিজেদের দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের যোগদানের ফলে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বৃটিশ বিরোধী মনোভাব আরও কঠোর হয়। কারণ, তুরস্কের খলিফা ছিলেন ইসলাম জগতের ধর্মগুরু। লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সংগে যুক্তভাবে শাসকবর্গের বিরুদ্ধে এক সংঘবদ্ধ আন্দোলন চালাবার নীতি গ্রহণ করে। রাউলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড মুসলমান সম্প্রদায়কেও বিক্ষুব্ধ করে তোলে। তাদের ক্ষোভ আরও প্রবল হল যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইংলণ্ডের সমর্থনে তুরস্কের খলিফাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক ছিল জার্মানির পক্ষে। যুদ্ধে জার্মানিও তার মিত্র পক্ষ সকলেই পরাজিত হয়। প্যারিস শান্তি-বৈঠকে বিজয়ী মিত্রপক্ষ তুরস্ক সম্বন্ধে কঠোর শাস্তিমূলক নীতি গ্রহণ করে। সেভ্রেনের সন্ধির দ্বারা তুরস্ক সাম্রাজ্যের অস্তিত্বকেই প্রায় বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়। তুরস্কের সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত ও ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। সুলতান একাধারে ছিলেন 'সুলতান' ও 'খলিফা' অথাৎ ধর্মগুরু। ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজের কাছে খলিফার রাজ্যচ্যুতি এবং তুর্কীসাম্রাজ্যের অংগচ্ছেদ ছিল পবিত্র ইসলাম ধর্মের উপর হস্তক্ষেপের সমতুল্য। তাদের ধারণা হয় যে, বৃটিশ সরকার খলিফার মানসম্ভ্রম ও মর্যাদা সম্পূর্ণ নষ্ট করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এই কারণে ইংলণ্ডের উপর চাপ সৃষ্টি করে খলিফাকে স্বস্থানে ও স্বমহিমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে তারা এক আন্দোলন শুরু করে। ইহা 'খিলাফত আন্দোলন' নামে পরিচিত। ভারতে খিলাফত আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মহম্মদ আলী ও সৌকত আলী।

অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি ; গান্ধীজীর আবির্ভাব : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে দেশে দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় জনসাধারণের দুর্দশার সীমা ছিল না। বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পেল। যুদ্ধের ঋণ পরিশোধের জন্য ভারতবাসীর উপর বিভিন্ন প্রকার করভার চাপতে লাগল।

এ সকল কারণে শাসকবর্গের বিরুদ্ধে একদিকে যেমন হতাশা অন্যদিকে তেমনি অসন্তোষের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে লাগল। কংগ্রেসের চরমপন্থী নেতাগণ উপলব্ধি করলেন যে প্রতিরোধ আন্দোলন ছাড়া বৃটিশ শাসকদের কাছ থেকে স্বায়ত্বশাসন বা স্বরাজের দাবী আদায় করা যাবে না। নরমপন্থী কংগ্রেসী নেতারও বৃটিশ সরকারের উপর আস্থা হারালেন। তাঁরা অনুনয় বিনয়, আবেদন নিবেদন নীতি ত্যাগ করে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে অগ্রসর হলেন। এইভাবে ভারতের জাতীয় আন্দোলন যখন ক্রমশঃ ইংরেজ-শাসকদের বিরুদ্ধে তীব্রতা লাভ করতে লাগল ঠিক সেই সময়ে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে গান্ধীজীর আবির্ভাব ঘটল। গান্ধীজীর আবির্ভাবের ফলে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এক নতুন পরিবেশ সৃষ্টি হল।

গান্ধীজীর আসল নাম হল মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। গুজরাটের পোরবন্দরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংলণ্ড থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে ভারতে ফিরে আসেন এবং আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। পরে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় যান এবং শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা নির্যাতীত ভারতীয়দের পক্ষ নিয়ে অহিংস পন্থায় তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে বিহারের চম্পারণ জেলার নীল চাষীদের পক্ষ নিয়ে তিনি নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এই বিদ্রোহকে তিনি অহিংস সত্যাগ্রহের পথে পরিচালিত করে সাফল্য অর্জন করেন। আমেদাবাদের মিল মালিকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা ধর্মঘট করলে গান্ধীজী শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিয়ে তাদের সংগ্রামকে জয়যুক্ত করেন। গুজরাটের কৃষক আন্দোলনেও তিনি নেতৃত্ব দেন। এভাবে গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগের নীতি ও রীতি ভারতে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ভারতের মত নিরস্ত্র দেশের পক্ষে অহিংস অসহযোগই যে



মহাত্মা গান্ধী

সর্বোত্তম পন্থা, সে বিষয়ে জনসাধারণের সন্দেহ থাকে না। ফলে ভারতবর্ষের পরবর্তী আন্দোলনগুলিতে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ বা অহিংস অসহযোগ নীতির প্রভাব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়।

কালক্রম

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ২৮শে জুলাই,	১৯১৪ খ্রীঃ
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান ১১ই নভেম্বর,	১৯১৮ খ্রীঃ
রাউলাট আইন	১৯১৯ খ্রীঃ

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলির বিবরণ দাও।
২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর।
৩। ভারতে ও বহির্ভারতে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। সেরাজেভো হত্যাকাণ্ড কি?
২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা উল্লেখ কর।
৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডকে সমর্থন ও সাহায্য করেছিল কেন?
৪। হোমরুল আন্দোলন বলতে কি বুঝ?
৫। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড কি?

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :
(ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির সম্রাট ছিলেন———।
(খ) ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন———শহরে অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ নিহত হয়।
(গ) রাসবিহারী বসু———ছদ্মনামে ভারত ত্যাগ করেন।
(ঘ) ———খ্রীষ্টাব্দে 'রাউলাট অ্যাক্ট' নামে এক আইন পাশ হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

॥ বলশেভিক বিপ্লব ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলার সময় ১৯১৭ সালে রাশিয়ার এক যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটে। পৃথিবীর ইতিহাসে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ফরাসী বিপ্লবের পর একমাত্র এই রুশ বিপ্লবই মানবসমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

কারণ ঃ ফ্রান্সের বুর্বো বংশীয় রাজাদের মত রাশিয়ার জারগণ ছিলেন অত্যন্ত অত্যাচারী, বিলাসী এবং অপদার্থ। তাঁরা দেশের সাধারণ লোককে উপেক্ষা করে কেবল অভিজাত শ্রেণীর পরামর্শে দেশের শাসন-কার্য চালাতেন। সব সময় দমননীতির সাহায্যে তাঁরা মানুষের গণতান্ত্রিক দাবীকে অস্বীকার করতেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ দেখেও তাঁরা নিজেদের সংশোধন করেন নি, ভেবেছিলেন— রাশিয়া যেমন আছে তেমনই থাকবে। ফলে তাঁরা নিজেদের খেয়ালখুশী মত দেশ শাসন করতে থাকেন। জার দ্বিতীয় নিকোলাস (১৮৯৪-১৯১৭) দেশের উন্নতি চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুই-এর মত পত্নীর আজ্ঞায় চলতেন। এদিকে রাণী আলেকজান্ডা রাসপুটিন নামে এক ভণ্ড যাজকের প্রভাবে পড়ে শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করতে থাকেন। এতে শাসনব্যবস্থায় বিশৃংখলা দেখা দিল। জার দ্বিতীয় নিকোলাস সব কিছু দেখেও নিশ্চুপ রইলেন, কোন প্রতিকার করলেন না। দেশের জনগণ বুঝতে পারল যে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে দেশের শাসনব্যবস্থার উন্নতি হবে না।

রাশিয়ার সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণী-বৈষম্য ছিল খুব বেশী। একদিকে ছিল ধনী জমিদার শ্রেণী এবং অন্যদিকে ছিল অসহায় দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী। কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর লোকেরা ভীষণ দুরবস্থার মধ্যে দিন কাটাত। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ছাড়া আর কোন জার রাশিয়ার সমাজ সংস্কারে হাত দেন নি। তিনি ভূমিদাস প্রথা আইন করে তুলে দিলেও সার্ফ বা ভূমিদাসদের বাস্তবে বিশেষ কোন উপকার হয় নি।

কৃষকেরা জমির মালিকানা পায় বটে কিন্তু দারিদ্রের জন্য সব জমি বিক্রয় করে ফেলে। এতে তাদের দুর্দশা আরও বৃদ্ধি পায়। রাশিয়ায় শ্রমিকদের অবস্থাও ছিল খুবই খারাপ। তাদের কম বেতনে বেশী সময় কারখানায় খাটতে হত। মালিকরা তাদের উপর শোষণ চালাত। শ্রমিকেরা শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেও জার সরকার শ্রমিকদের দাবীতে কান দিতেন না। এর ফলে শ্রমিকরা জারতন্ত্রের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। সেই সময় রাশিয়ার জার সরকার বিরোধী একটি সমাজতান্ত্রিক দল ছিল। এর নাম সোশিয়েল ডেমোক্রেটিক পার্টি। এ দলের সংখ্যালঘিষ্ঠরা 'মেনশেভিক' এবং সংখ্যাগরিষ্ঠরা 'বলশেভিক' নামে পরিচিত ছিল। বলশেভিকগণ লেলিনের মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। তারা শ্রমিক-অসন্তোষের সুযোগ নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে মার্কসবাদী প্রচার চালায়। তারা শ্রমিকগণকে বুঝায়, রাশিয়ায় জারতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে শ্রমিক সরকার স্থাপন না করলে খেটে খাওয়া মানুষের উন্নতির কোন আশা নেই। বলশেভিকদের চেষ্টায় রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী বিপ্লবের জন্য সংঘবদ্ধ হয়।

রাশিয়ায় জার-সরকারের স্বৈর শাসনে সমাজের বিভিন্ন স্তরে যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়েছিল তা প্রকাশ পেল রুশ-সাহিত্যিকদের রচনাতে। গোর্কি, টলস্টয়, টুরগেনিভ প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ নিপীড়িত মানুষের মধ্যে মানসিক চেতনা জাগিয়ে তুললেন। তাঁদের রচনা সকলকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস যোগাল, সকলকে আরও বেশী বিদ্রোহী করে তুলল।

রাশিয়ার অভ্যন্তরে যখন চারদিকে অসন্তোষ তখন এল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। জার-সরকার জনমতকে অগ্রাহ্য করে এই যুদ্ধে রাশিয়াকে জড়িয়ে দেন। যুদ্ধ করতে গিয়ে রাশিয়ার পরাজয় হয় এবং জার-সরকারের দুর্বলতা দেশবাসীর নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ে। এছাড়া যুদ্ধের দরুণ দেশে খাদ্য সমস্যা তীব্রতর হয়। গরীব লোকেদের কষ্টের সীমা থাকে না। ফলে জারের বিরুদ্ধে লোকেদের অসন্তোষ প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে। এই সময়ে বলশেভিকগণ জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে

জনসাধারণকে বিদ্রোহের পথে চালনা করে। তাদের আহ্বানে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে পেট্রোগ্রাড শহরের শ্রমিকের একটি ধর্মঘট করলে সমগ্র দেশে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। রাশিয়ার সর্বত্র দাংগাহাংগামা শুরু হয়। জার-সরকার সৈন্য দিয়ে তা দমন করতে চাইলেন। কিন্তু সৈন্যগণ বিক্ষোভকারীদের দমন না করে তাদের সমর্থন করল। বিদ্রোহ পরিচালনা করবার জন্য শ্রমিক ও সেনাদল মিলে পেট্রোগ্রাড শহরে একটি সোভিয়েট স্থাপন করল। পেট্রোগ্রাড শহরের বিপ্লবী সরকার স্থাপনের কথা ছড়িয়ে পড়লে দেশের সর্বত্র বিদ্রোহ শুরু হয়। এইভাবে পরিস্থিতি জার সরকারের হাতের বাইরে চলে যায়। বিদ্রোহ দমন করতে ব্যর্থ হলে জার দ্বিতীয় নিকোলাস সিংহাসন ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এইভাবে শেষ হল রাশিয়ার জারতন্ত্র।

ডুমা বা জাতীয় সভা একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করে রাশিয়ায় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করল। নবগঠিত এই সরকারের সদস্যগণ বেশীর ভাগ এসেছিলেন বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে। এই অস্থায়ী সরকার দেশে কতকগুলি উদারনৈতিক সংস্কার সাধন করলেও অর্থনৈতিক সমস্যার কোন সমাধান করতে পারে নি। ফলে শ্রমিক-কৃষকদের অবস্থার কোন উন্নতি হল না। এই অবস্থায় অস্থায়ী সরকারের প্রধান হলেন মেনশেভিক দলের নেতা কেরেনস্কি। দেশের জনমত শান্তির পক্ষপাতী হলেও তিনি জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার নীতি গ্রহণ করেন। এদিকে বলশেভিক দলের সংগে এই অস্হায়ী সরকারের মতবিরোধ শুরু হয়। বলশেভিক দল প্রচার ও সংগঠনের মাধ্যমে রাশিয়ার শ্রমিকদের হাত করে নেয়। তারা শ্রমিকদের বুঝায়, এ সরকারের মাধ্যমে শ্রমিক ও সাধারণ লোকের কোন উন্নতি হবে না। এজন্য দরকার দ্বিতীয় বিপ্লব। এই বিপ্লবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রজাতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বলশেভিকদের এরকম প্রচারের ফলে রাশিয়ার শ্রমিকেরা বলশেভিকদের নীতির সমর্থক হয়ে পড়ল।

এই সময়ে লেনিন সুইজারল্যাণ্ডে তাঁর নির্বাসন থেকে রাশিয়ায় ফিরে আসেন এবং বলশেভিক দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে রাশিয়ার রাজনীতিতে

এক নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করেন তিনি বললেন যে, এই অস্থায়ী সরকার কখনও দেশের মংগল করতে পারবে না—এ সরকারকে উচ্ছেদ করতে হবে। তিনি রুশবাসীর উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন যে বলশেভিকগণ ক্ষমতা পেলে শ্রমিককে রুটি, কৃষককে জমি ও সেনাদলকে শান্তি দেবে। এর ফলে শ্রমিক, কৃষক ও সেনাদের মধ্যে বলশেভিকদলের দ্রুত প্রভাব বাড়তে থাকে। দেশের বিভিন্ন স্থানে বলশেভিকরা শ্রমিক-কৃষকদের নিয়ে সোভিয়েট স্থাপন করতে শুরু করে। এইভাবে শহর-গ্রামে বলশেভিকদের সংগঠন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অবশেষে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর লেনিন, ট্রট্স্কী, স্ট্যালিন প্রভৃতি বলশেভিক নেতাদের সাহায্যে রাশিয়ায় বিপ্লব শুরু করেন। ইতিহাসে এই বিপ্লবের নাম 'নভেম্বর বিপ্লব'। শেষ পর্যন্ত অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে এই বিপ্লবীরাই জয়ী হয়। লেনিন শ্রমিক শ্রেণীর প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেন এবং ঐ নবগঠিত বলশেভিক সরকারের প্রধান হলেন।



লেনিন

লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক সরকার জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে সন্ধি স্থাপন করেন এবং রাশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সরকার দেশের সম্পত্তি, জমি প্রভৃতি সরকারের সম্পত্তিতে পরিণত করেন। জার-শাসনের সময় যে সব পরাধীন জাতি ছিল, তাদের স্বাধীনতা দেন। শ্রমিকদের উপর শোষণ ও অত্যাচার বন্ধ করেন। এইভাবে বলশেভিক সরকার দেশে সাম্যবাদী শাসন ও শ্রেণীহীন সমাজ গঠনে উদ্যোগী হলেন।

ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে রুশ বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া :—পরবর্তী কালে রাশিয়া থেকে বিপ্লবের প্রভাব পৃথিবীর অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়ে। মার্কসের আদর্শের দ্বারা চালিত হয়ে লেনিন ও তাঁর সহকর্মী ট্রটস্কী পৃথিবীর সর্বত্র বৈপ্লবিক আন্দোলন প্রসারিত করার জন্য তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের অর্থনৈতিক

দুরবস্থা ও শ্রমিক অসন্তোষ তাঁদের মনে বিপ্লবের সাফল্য সম্বন্ধে আশার সঞ্চার করেছি। জার্মানি ও ইটালীতে সাম্যবাদ কিছুকালের জন্য প্রচারিত হলেও পরে স্বৈরতন্ত্রের আবির্ভাবে তা বিলোপ হয়ে যায়। রুশ বিপ্লবের ফলে ইউরোপের ধনতন্ত্রী দেশগুলি ভীত হয়ে পড়ে। এগারটি রাষ্ট্র একযোগে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে আক্রমণ করলে বিপ্লবী গণতন্ত্র ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়। শেষে লেনিনের নেতৃত্বে তারা সেই বিপদ থেকে মুক্ত হয়। ক্রমে তারা সকলেই সোভিয়েট সরকারকে স্বীকার করে নেয়। এই সময়ে চীনের নেতা ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়। ফলে চীনে সাম্যবাদী আদর্শ বিস্তার লাভ করে।

রুশ বিপ্লবের ভাবধারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে প্রভাবিত করেছে; নিপীড়িত ও শোষিত মানব সমাজ রুশ বিপ্লবের আদর্শ থেকেই মুক্তি লাভের অনুপ্রেরণা পেয়েছে। ক্রমে বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলিতেও রুশ বিপ্লবের আদর্শ এই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দারুণভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আজ রাশিয়ার আদর্শে ও সহযোগিতায় পৃথিবীর বহুদেশে সমাজবাদী রাষ্ট্র স্থাপিত হয়েছে।

কালক্রম

লেনিন	১৮৭০-১৯২৪ খ্রীঃ
রুশ বিপ্লব ও জারের সিংহাসন ত্যাগ মার্চ,	১৯১৭ খ্রীঃ
বলশেভিক বিপ্লব	নভেম্বর, ১৯১৭ খ্রীঃ

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। রুশ বিপ্লবের কারণগুলি কি কি?

২। ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে রুশ বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। 'ডুমা' বলতে কি বোঝ ?
২। দ্বিতীয় নিকোলাস সম্বন্ধে কি জান ?
৩। রুশ বিপ্লবের প্রভাব বিস্তারকারী রাশিয়ার কয়েকজন সাহিত্যিকের নাম উল্লেখ কর।
৪। বলশেভিক দলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৫। মহামতি লেনিন সম্বন্ধে কি জান ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। দু' এক কথায় উত্তর দাও ঃ
(ক) নভেম্বর বিপ্লব কত খ্রীষ্টাব্দে হয় ?
(খ) রাশিয়ার সম্রাটের উপাধি কি ছিল ?
(গ) দ্বিতীয় নিকোলাস কে ছিলেন ?
(ঘ) মেনশেভিক দলের নেতা কে ছিলেন ?
(ঙ) লেলিন কোন্ দলের নেতা ছিলেন ?
(চ) ট্রট্স্কী কে ছিলেন ?

২। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ
(ক) সোসিয়েল ডেমোক্রেটিক পার্টির সংখ্যালঘিষ্ঠরা——নামে পরিচিত।
(খ) বলশেভিকগণ——মতবাদে বিশ্বাসী ছিল।
(গ) ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে——শহরের শ্রমিকরা একটি ধর্মঘট করলে সমগ্র দেশে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে।
(ঘ) লেনিন——তাঁর নির্বাসন থেকে রাশিয়ায় ফিরে আসেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

॥ ইউরোপ ॥

(১৯১৯-১৯৩৯ খ্রীঃ)

প্যারিসের শান্তি সম্মেলন এবং ইউরোপের পুনর্গঠন :—প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির আত্মসমর্পণের পর ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস নগরীতে পৃথিবীর ৩২টি দেশের প্রতিনিধিবর্গ সন্ধির শর্ত আলোচনার উদ্দেশ্যে একটি সম্মেলনে সমবেত হন। এই সম্মেলন 'প্যারিসের শান্তি সম্মেলন' নামে খ্যাত।

এই সম্মেলনে দেশ বিদেশ থেকে বহু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে চারজন হলেন প্রধান। এঁরা হলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড লয়েড জর্জ, ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ ক্লিমেনশো এবং ইটালীর প্রধানমন্ত্রী ভিটোরিও ওর্লাণ্ডো। ক্লিমেনশো এই সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

প্যারিস শান্তি সম্মেলনের পূর্বেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন তাঁর 'চতুর্দশ দফা' ঘোষণা করেছিলেন (৮ই জানুয়ারী, ১৯১৮ খ্রীঃ)। এই ঘোষণায় উল্লেখ ছিল, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ভাগ্য বিজয়ী রাষ্ট্রবর্গের ইচ্ছানুযায়ী নির্ধারিত হবে না—জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী তা করতে হবে।

প্যারিস শান্তি সম্মেলন বিভিন্ন দিক দিয়ে ভিয়েনা সম্মেলনের সঙ্গে তুলনীয়। ভিয়েনা সম্মেলনের পূর্বে যেমন উচ্চ আদর্শের মৌখিক পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে শেষপর্যন্ত সংকীর্ণ ও স্বার্থপর নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল, প্যারিস শান্তি সম্মেলনেরও ঠিক তাই হল। বিশ্বে প্রকৃত শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে 'ন্যায়-বিচার,' 'সততা' প্রভৃতির ভিত্তিতে উইলসন যে আদর্শ প্যারিস সম্মেলনে তুলে ধরেছিলেন, শেষ পর্যন্ত বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির স্বার্থপরতার জন্য সে সব আদর্শকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়। ইউরোপের শক্তিসাম্য ও ফ্রান্সের নিরাপত্তা যাতে বজায় থাকে, আর জার্মানি ভবিষ্যতে যাতে শক্তিহীন হয়ে পড়ে সেদিকে দৃষ্টি রেখেই প্যারিস সম্মেলনে কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিগুলির মধ্যে ভার্সাই সন্ধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভার্সাই সন্ধির দ্বারা ইউরোপের পুনর্বণ্টন ও পুনর্গঠন করার ব্যবস্থা

হল এবং তাতে ইউরোপের মানচিত্র সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল। অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যকে ভেংগে হাংগেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া ও অষ্ট্রিয়া এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করা হল। এর বাকী অংশ ইটালী, সার্বিয়া ও রুমানিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের সংগে যুক্ত করা হল। তুরস্ক সাম্রাজ্যকেও বিভক্ত করে কয়েকটি আরব রাষ্ট্রকে স্বাধীনতা দেওয়া হল এবং পোলাণ্ডকে একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করা হল। পরাজিত জার্মানি সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা নেওয়া হল তাতে ন্যায় ও নীতির মর্যাদা রক্ষা করা হল না। মিত্রশক্তিবর্গ একটি প্রতিশোধের মনোভাব নিয়ে জার্মানির উপর অতি নিষ্ঠুর কতকগুলি শর্ত চাপিয়ে দিল। জার্মান রাষ্ট্রের কয়েকটি অংশ কেড়ে নিয়ে তা ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও পোলাণ্ডের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হল। জার্মানির উপনিবেশগুলি বিজয়ী রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিল। এছাড়া যুদ্ধে মিত্রশক্তির যে ক্ষতি হয়েছিল, তারজন্য পণ্য ও অর্থে বিপুল ক্ষতি পূরণ করতে হবে—জার্মানিকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হল। ভবিষ্যতের জার্মানি যাতে আবার শক্তিশালী হয়ে উঠতে না পারে সেজন্য তাদের সামরিক শক্তি একেবারে পংগু করে দেওয়া হল।

বিজয়ী মিত্রবর্গ পরাজিত জার্মানির উপর সন্ধির অমানুষিক শর্ত-গুলি চাপিয়া দিয়ে কখনই ন্যায় সঙ্গত বিচার করে নি। এতে জার্মান জাতির স্বার্থ ও আত্মমর্যাদায় ভীষণ আঘাত লেগেছিল। এর ফলে যে তুষানল জার্মান জাতির অন্তরে অবিরত জ্বলতে থাকে পরবর্তীকালে তা প্রজ্বলিত হয়েই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা করেছিল।

ফ্যাসিবাদের উদ্ভব: ভার্সাই সন্ধির সময়ে ইউরোপের মানচিত্র যেভাবে পরিবর্তন করা হয়েছিল তাতে সকলে সন্তুষ্ট হল না। তাছাড়া যুদ্ধের ফলে ইউরোপের প্রায় সব দেশেরই সাধারণ লোকের অতি দুরবস্থা হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিয়ে ইটালীকে যে পরিমাণ ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল, প্যারিসের শান্তি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত দ্বারা তার সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ হয়নি। স্বভাবতই ইটালীর জনগণের মনে এক দারুণ অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল। তাছাড়া যুদ্ধের পর ইটালীতে

চরম দুরবস্থা ও আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছিল। এই দুর্দিনে ইটালীতে বেনিটো মুসোলিনী নামে একজন বিখ্যাত জননেতার আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি যুদ্ধ-ফেরত দুর্দশাগ্রস্থ সৈনিকদের নিয়ে একটি শক্তিশালী দল গঠন করেন। এদের বলা হত 'ফ্যাসিষ্ট'।



মুসোলিনী

ফ্যাসিষ্টদের আদর্শকে বলা হয় 'ফ্যাসিবাদ'। ফ্যাসিবাদ হ'ল প্রচলিত গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিরোধী। ফ্যাসিষ্টদের মতে নেতাই হলেন দেশের সর্বোচ্চ শাসক। শাসকদল ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকা অপ্রয়োজনীয়। ফ্যাসিষ্টগণ সমাজতন্ত্র এবং শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাস করে না। শান্তির চেয়ে যুদ্ধই ছিল তাদের নিকট বিশেষ কাম্য।

১৯২২ সালে মুসোলিনীর নেতৃত্বে ফ্যাসিষ্ট দল একরকম জোর করে ইটালীর শাসনভার গ্রহণ করে। এরপরে সমস্ত বিরুদ্ধ দলগুলিকে ধ্বংস করে মুসোলিনী ইটালীর সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। তিনি ইটালীর কিছু কিছু উন্নতি করেছিলেন। তাঁর চেষ্টায় দেশের নানা জায়গায় রাস্তাঘাট তৈরী হয়, জলাভূমি পরিষ্কার করে শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়; জিনিসপত্রের দাম বেঁধে দিয়ে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি করে লোকের দুঃখ-দুর্দশাও অনেকটা দূর করা হয়। কিন্তু অপর দিকে তিনি দেশের সমস্ত দলকে নিশ্চিহ্ন করে গণতন্ত্রের বিনাশ সাধন এবং ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করেন। তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা ছিল খুব বেশী। এই উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য তিনি একটি সেনাদল গঠন করলেন। এদের সাহায্যে তিনি অন্যায়ভাবে পূর্ব আফ্রিকার আবিসিনিয়া রাজ্য অধিকার করেন এবং পরে আরও দেশ জয় করবার জন্য তিনি উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। কিন্তু এতে তিনি নিজের এবং দেশের সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন।

নাৎসীবাদের উদ্ভব :—মহাযুদ্ধের পর জার্মানিতেও অসন্তোষ জমে

ওঠে। ভার্সাই সন্ধির অপমানজনক শর্তগুলি প্রত্যেক জার্মানবাসীর মনে প্রতিশোধ স্পৃহা জাগিয়ে তোলে। এর সুযোগ নিয়ে মুসোলিনীর মত অ্যাডল্‌ফ হিটলার নামে একজন শক্তিমান নেতা জার্মান রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা নিজে হস্তগত করেন।



অ্যাডল্‌ফ হিটলার

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হিটলার জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টির সদস্য হন। পরে এই দলের নাম পরিবর্তন করে জাতীয় সমাজতন্ত্রী দল (ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট পার্টি) রাখা হয়। এই দলটি সংক্ষেপে 'নাৎসী' নামে পরিচিত। হিটলার এই দলের সর্বময় কর্তা হন।

নাৎসীগণ যে আদর্শে বিশ্বাসী তাকে বলা হয় নাৎসীবাদ। ফ্যাসিবাদের মত নাৎসীবাদেও গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার কোন স্থান নেই। নাৎসীরা ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদী। তারাও ব্যক্তি পূজায় বিশ্বাসী। দলনেতাই ছিলেন জাতি ও রাষ্ট্রের নেতা। তাদের প্রতীক ছিল স্বস্তিকা চিহ্ন।

ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানির প্রতি যে অবিচার করা হয়েছিল তার প্রতিশোধ নেওয়া ছিল এদের প্রধান উদ্দেশ্য। ক্ষমতালাভ করে হিটলার জার্মানির পুনর্গঠনের জন্য মন দেন। দেশের শিল্পগুলির বিশেষ উন্নতি করা হল, বেকার সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হল এবং আরও অনেক জনহিতকর কার্য এই সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু জার্মানির ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মুসোলিনীর মত হিটলারও সৈন্যগঠনের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। তিনি ইটালী ও জাপানের সংগে মিত্রতা স্থাপন করলেন। এইভাবে পৃথিবীতে আবার একটা বিরাট যুদ্ধের আভাস ঘনিয়ে এল।

দেশকে সব বিষয়ে শক্তিশালী করবার পর হিটলার দাবী করলেন যে, জার্মানির বাইরে যে সব অঞ্চলে জার্মানিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেগুলি জার্মানিকে ছেড়ে দিতে হবে। এই অজুহাতে হিটলার একরকম বিনা বাধায় অষ্ট্রিয়া অধিকার করে নিলেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার একটি অংশও তিনি এভাবে দখল করে নিলেন। কিন্তু এতেও তাঁর রাজ্যলিপ্সা কমল না। এরপর

তাঁর দৃষ্টি পড়ল পোলাণ্ডের দিকে। এইভাবে জার্মানি বিশ্বযুদ্ধের দিকে এগিয়ে চলল।

জাতিসংঘ :—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা লক্ষ্য করে সকলেই যুদ্ধের অপকারিতা বুঝতে পেরেছিল। পুনরায় যাতে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের অশান্তি ছড়িয়ে পড়তে না পারে তার উপায় সকলে চিন্তা করতে লাগল। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইলসন বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রচেষ্টার জন্য আন্তর্জাতিক সংঘ গঠনের প্রস্তাব দেন। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ তাঁর প্রস্তাবে অনুপ্রাণিত হয়। তাই ভার্সাই সন্ধির সময়ে বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। সমস্ত জাতি পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও সহযোগিতা বজায় রেখে পৃথিবীতে যাতে শান্তি স্থাপন করতে পারে এটাই ছিল জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য। যুদ্ধে বিজয়ী এবং নিরপেক্ষ কতকগুলি রাষ্ট্র প্রথমে এই সংঘে যোগ দিয়েছিল। পরে অবশ্য পরাজিত রাষ্ট্রগুলিও সভ্য হবার অনুমতি পেয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে যোগ দিল না। পরে মতের অমিল হওয়ায় জাপান, ইটালী এবং সর্বশেষে জার্মানি জাতিসংঘ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

সুইজারল্যাণ্ডের অন্তর্গত জেনেভা শহরে জাতিসংঘের প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয়। পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে বিবাদ প্রভৃতি মেটাবার জন্য হল্যান্ডের হেগ শহরে একটি আন্তর্জাতিক বিচার সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাছাড়া শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থাও গঠিত হয়েছিল।

সাফল্য ও ব্যর্থতা :—জাতিসংঘ অনেকগুলি ছোটখাট আন্তর্জাতিক বিবাদ মেটাতে সক্ষম হয়েছিল। তুরস্ক ও ইরাকের মধ্যে সীমানা নিয়ে বিবাদ দেখা দিলে সংঘের হস্তক্ষেপে তা মীমাংসা করা সম্ভব হয়। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীস কর্তৃক বুলগেরিয়া আক্রান্ত হলে জাতিসংঘের নির্দেশে গ্রীস যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হয়। তাছাড়া উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, নারী বিক্রয় ও ভেজাল ঔষধ বিক্রয় বন্ধের ব্যাপারে জাতিসংঘ কিছুটা কল্যাণমূলক কাজ করেছে।

কিন্তু জাতিসংঘের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ হতে পারেনি। তার কারণ, ব্যক্তিগত স্বার্থে আঘাত লাগলেই বড় বড় রাষ্ট্রগুলি সংঘের নীতি মানতে অস্বীকার করত। এদের উপর জাতিসংঘ কোনরকম জোরই খাটাতে পারত না। জাপান যখন চীনের মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ অন্যায়ভাবে অধিকার করল, আর ইটালী আক্রমণ করল আবিসিনিয়াকে, তখন জাতিসংঘ এদের কাউকেই রোধ করতে পারেনি। এই কারণে জাতিসংঘের মর্যাদা কমে গেল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে এর বিলোপ ঘটল।

কালক্রম

প্যারিস শান্তি সম্মেলন	১৯১৯ খ্রীঃ
ভার্সাই সন্ধি	১৯১৯ খ্রীঃ
ইটালীতে মুসোলিনীর শাসনভার গ্রহণ	১৯২২ খ্রীঃ
জার্মানিতে হিটলারের ক্ষমতা লাভ	১৯৩৩ খ্রীঃ
ইটালী কর্তৃক আবিসিনিয়া আক্রমণ	১৯৩৫ খ্রীঃ

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। প্যারিসের শান্তি সম্মেলন সম্বন্ধে কী জান?
২। ভার্সাই সন্ধির ফলে কিভাবে ইউরোপের পুনর্গঠন হয়েছিল?
৩। মুসোলিনীর নেতৃত্বে ইটালীতে ফ্যাসিষ্টদের কার্যকলাপ কিরূপ ছিল?
৪। জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে কি জান?

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। চতুর্দশ দফা'র মূল কথা কি ছিল?
২। ফ্যাসিবাদের বৈশিষ্ট্য কি?
৩। নাৎসীদের আদর্শ কি ছিল?
৪। জাতিসংঘের উদ্দেশ্য কতটা সফল হয়েছিল?

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। দু-এক কথায় উত্তর দাও :—
(ক) 'চতুর্দশ দফা' কে ঘোষণা করেছিলেন?
(খ) ইটালীতে কে ফ্যাসিষ্ট দল গঠন করেন?
(গ) ফ্যাসিষ্ট দল কত সালে ইটালীর শাসনভার গ্রহণ করে?
(ঘ) জার্মানিতে নাৎসী দলের নেতা কে ছিলেন?
(ঙ) নাৎসীদের প্রতীক চিহ্ন কি?
(চ) জাতিসংঘের প্রধান কার্যালয় কোথায় ছিল?
(ছ) আন্তর্জাতিক বিচার সভা কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

পঞ্চদশ অধ্যায়

॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পঁচিশ বছর পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এতবড় বিধ্বংসকারী যুদ্ধ এর পূর্বে আর ঘটেনি। তাই এর গুরুত্ব ও প্রভাব বিশ্বের ইতিহাসে সর্বাধিক। এই যুদ্ধ ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ ও মর্মান্তিক।

কারণ :—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে জার্মানি চাপে পড়ে অপমানজনক শর্তে সন্ধি করেছিল। জোর করে চাপান এই সন্ধির শর্তগুলি দীর্ঘদিন মেনে চলা জার্মানির পক্ষে সম্ভব নয়। তাই পরবর্তী-কালে জার্মান রাষ্ট্রনায়কেরা এই সন্ধির শর্ত অগ্রাহ্য করে চলছিলেন। এতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি শক্তিমান দেশগুলি জার্মানির উপরে খুবই অসন্তুষ্ট ছিল। তারা জার্মানিকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করল। জার্মানির দাম্ভিক রাষ্ট্রনায়ক এ্যাডল্ফ হিটলার প্রভাবশালী প্রতিপক্ষের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার জন্য জার্মান জাতিকে সুগঠিত করেন। তিনি ইটালীর রাষ্ট্রনায়ক মুসোলিনী এবং জাপানের সম্রাট তোজোর সাথে গোপনে বোঝাপড়া চালান। এইভাবে একদিকে ইংলণ্ড ফ্রান্স, আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ এবং অন্যদিকে জার্মানি, ইটালী, জাপান প্রভৃতি দেশ চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হল। এই দুটি বিবাদ-মান গোষ্ঠীর 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাবই দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের প্রধান কারণ।

দ্বিতীয়তঃ, জার্মানীর ন্যায় ইটালী ও জাপানের উগ্র সাম্রাজ্যবাদী নীতিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ। ইটালীর রাষ্ট্রনায়ক মুসোলিনী আবিসিনিয়া এবং জাপান চীনের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করলে পুনরায় আর একটা মহাযুদ্ধের আভাষ দেখা দেয়।

তৃতীয়তঃ, এই সময়ে ইংগ-ফরাসী সম্পর্কের কিছুটা অবনতি ঘটে এবং তাদের পররাষ্ট্র নীতি ভিন্নমুখী হয়ে পড়ে। জার্মানি উভয় রাষ্ট্রের এই মতবিরোধের পূর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়ল না।

চতুর্থতঃ, জাতিসংঘের বিফলতাও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি প্রধান কারণ। বিশ্বে শান্তি স্থাপনের যে উদ্দেশ্য নিয়ে একদিন জাতিসংঘ গঠিত হয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। জাতিসংঘের পক্ষে শক্তিশালী

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলিকে দমন করা সম্ভব হয়নি। এইসব রাষ্ট্রের আগ্রাসী নীতির ফলেই পুনরায় আর একটি মহাযুদ্ধের সৃষ্টি হয়।

এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হল হিটলারের পোলাণ্ড আক্রমণ। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার পোলাণ্ড আক্রমণ করলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ৩রা সেপ্টেম্বর জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।

এই যুদ্ধে জার্মানির বিপক্ষে যে সকল রাষ্ট্র সংঘবদ্ধ হয়েছিল তাদের বলা হয় 'মিত্রপক্ষ'। প্রথমে জার্মানির বিপক্ষ দলে ছিল ইংলণ্ড ও ফ্রান্স। পরে আমেরিকা ইংলণ্ডের পক্ষে যোগ দেয়। হিটলার কর্তৃক রাশিয়া



চার্চিল



রুজভেল্ট

আক্রান্ত হলে রাশিয়াও জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এই সময়ে ইংলণ্ড, আমেরিকা ও রাশিয়ার রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন যথাক্রমে চার্চিল, রুজভেল্ট ও স্ট্যালিন।

ফলাফল :—দীর্ঘ ছ' বছর যুদ্ধের পর জার্মানি ও তার সহযোগী দেশগুলি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল। উচ্চাভিলাষী জার্মান রাষ্ট্রনায়ক হিটলার মনের দুঃখে আত্মহত্যা করেন। ইটালীর জনগণের হাতে মুসোলিনী প্রাণ হারান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার অনেকগুলি দেশ এবং আমেরিকা জড়িত হয়ে পড়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও আরও শক্তিশালী আনবিক অস্ত্র এই যুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছিল। ফলে সারা পৃথিবীতে ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা চলেছিল। আনবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহর দুটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। এই যুদ্ধেও অগণিত মানুষ হতাহত হয় এবং বিভিন্ন দেশের

বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। যুদ্ধের অবসানে সারা পৃথিবীব্যাপী দেখা দেয় বেকারত্ব ও খাদ্য সংকট।

এই যুদ্ধের ফলে বিশ্ব রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন দেখা দেয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিজয়ী মিত্র পক্ষের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়। এই বিবাদের ফলে পৃথিবীতে দুটি রাষ্ট্র জোটের সৃষ্টি হয়। একজোটে রয়েছে সোভিয়েট রাশিয়ার নেতৃত্বে কয়েকটি সাম্যবাদী সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র। অন্য জোটে রয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড এবং তাদের মিত্রগণ। অবশ্য কয়েকটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রও আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই পৃথিবীতে প্রাধান্য স্থাপনের ব্যাপার নিয়ে দুটি জোটের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই চলছে।

এই সংকটময় পরিস্থিতিতেও বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য অনেক দেশই উদ্‌গ্রীব। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু পরেই গঠিত হল 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ'।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ভারতেও এসে পড়ে। এই যুদ্ধের পরে ভারতে ইংরেজদের সাম্রাজ্য বজায় রাখা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে।

কালক্রম

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা সেপ্টেম্বর,	১৯৩৯ খ্রীঃ
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি	১৯৪৫ খ্রীঃ

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। কি কি কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ?

২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। ভার্সাই সন্ধিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী করা হয় কেন ?

২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য জাতিসংঘের ব্যর্থতা কতখানি দায়ী ?

৩। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ কি ?

৪। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর কোথায় কি ক্ষতি হয়েছে ?

নিবন্ধমূলক প্রশ্ন

১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

(ক) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়——খ্রীষ্টাব্দে। (খ) এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হল হিটলারের——আক্রমণ। (গ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে রাশিয়ার রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন——। (ঘ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়——খ্রীষ্টাব্দে। (ঙ) আনবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে জাপানের——ও——শহর দুটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়।

ষোড়শ অধ্যায়

॥ ভারতবর্ষ ॥

(১৯১৯-১৯৪৭ খ্রীঃ)

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ভারতবাসীর দুর্দশার সীমা ছিল না। দেশের দ্রব্যমূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং অনাহারে ও মহামারীতে বহু লোক মারা গিয়েছিল। দেশের এই দুর্দশার মূলে যে বৃটিশ সরকার সে বিষয়ে কারও মনে কোন সন্দেহ রইল না। ফলে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসী বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। তখন বৃটিশ সরকার ভারতবাসীর উপর তীব্র দমন-মূলক রাউলাট আইন প্রবর্তন করলেন। এই আইনবলে বিনা বিচারে জাতীয় নেতাদের কারারুদ্ধ করার নীতি গৃহীত হয়। এই আইনের প্রতিবাদে গান্ধীজী দেশ-ব্যাপী আন্দোলন শুরু করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র ও অহিংসা জনগণের উপর পুলিশ নৃশংস ভাবে গুলিবর্ষণ করে (১৯১৯ খ্রীঃ ১৩ই এপ্রিল)। ফলে অসংখ্য নরনারী হতাহত হয়। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারের সঙ্গে ভারতবাসীর এক অভূতপূর্ব সংগ্রামের সূত্রপাত হল।

অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০ খ্রীঃ) ঃ ১৯২০ সালে গান্ধীজী ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সর্বপ্রকারে অসহযোগিতা করে ইংরেজ শাসন অচল করবার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলেন। শান্তিপূর্ণ উপায়ে অন্যায়ের প্রতিরোধ করাই ছিল তাঁর প্রধান সংকল্প। এতদিন কংগ্রেসের যে আন্দোলন সমাজের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল গান্ধীজী এবার তা দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন। তখন শিক্ষিত ব্যক্তিদের পাশে অশিক্ষিত কৃষক-শ্রমিকও এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে বাঁধ ভাংগা বন্যার মত সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রসারিত হতে লাগল। আইনজীবীরা ইংরেজদের বিচারশালা এবং সরকারী চাকুরিয়ারা অফিস বর্জন করলেন। সরকারী খেতাব প্রত্যাখ্যান করা হল। ছাত্রেরা স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করল। বিলাতী কাপড় ও বিদেশী পণ্য বর্জিত হল। শুরু হল দেশীয় পণ্যের ব্যাপক ব্যবহার। স্থানে স্থানে স্তূপ করে বিদেশী বস্ত্র পুড়িয়ে দেওয়া হল। ইংরেজ সরকার দেশবন্ধু

চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি জননেতাদের এবং অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করলেন। তবুও আন্দোলন দুর্বার গতিতে সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলল। গান্ধীজীর মূল লক্ষ্য ছিল—সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে পুরোপুরি অহিংসা ভাবে চালাবার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। কিন্তু বিহারের গোরক্ষপুর জেলার চৌরীচেরাতে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল। সেখানে আন্দোলনকারীরা পুলিশ থানায় অগ্নি সংযোগ করলে ২২ জন পুলিশ নিহত হল। এই ঘটনায় গান্ধীজী অতিশয় মর্মাহত হয়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন।

হঠাৎ এই আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়াতে অনেক নেতাই অসন্তুষ্ট হন। আপাতদৃষ্টিতে এই আন্দোলন ব্যর্থ বলে মনে হলেও আসলে কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি। এই আন্দোলনের মাধ্যমে কংগ্রেস তার সংগ্রামী রূপ দেখাতে সক্ষম হয়েছিল। একই ধরনের নীতি ও আদর্শের প্রভাবে ভারতীয়দের রাজনৈতিক চেতনা বেড়ে গিয়েছিল।

অসহযোগ আন্দোলনের পরবর্তী স্তর : অসহযোগ আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে অংশ গ্রহণ করেছিল। এতে ইংরেজ সরকার শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তাই তাঁরা ভারতবাসীর জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরাবার জন্য হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা চালালেন। অপর দিকে ১৯২৪ সালে কারামুক্তি লাভের পরে গান্ধীজী সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপনের জন্য আন্তরিক ভাবে প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন।



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

এদিকে গান্ধীজী হঠাৎ অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়ায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহেরু প্রভৃতি নেতারা খুব মর্মাহত হন। পরবর্তী কালে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে কংগ্রেসের অন্যান্য

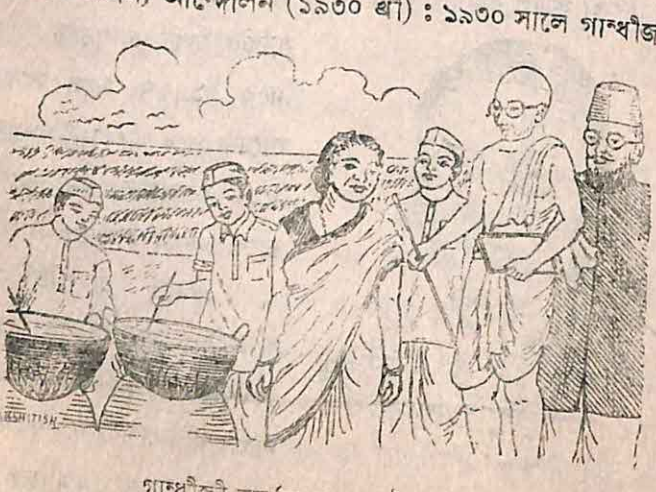
সদস্যদের সঙ্গে তাঁদের মত পার্থক্য দেখা দেয়। তাই ১৯২৩ সালে তাঁরা 'স্বরাজ্য দল' নামে একটি দল প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী আইন সভার নির্বাচনে এই দল বিশেষ সাফল্য লাভ করেছিল।

১৯২৭ সালে ইংরেজ সরকার ভারতের শাসন-ব্যবস্থা পর্যালোচনা করতে স্যারজন সাইমনের নেতৃত্বে একটি কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশনে কোন ভারতীয় ছিল না বলে জাতীয় কংগ্রেস সেই কমিশন বর্জন করল। ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ করে। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পরে লন্ডনে একটি গোল-টেবিল বৈঠক আহ্বান করা হয়। কিন্তু কংগ্রেস এই বৈঠকে যোগদানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল।



জওহরলাল নেহেরু

আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০ খ্রী): ১৯৩০ সালে গান্ধীজী তাঁর



গান্ধীজী কর্তৃক লবণ আইন অমান্য

আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করলেন। লবণ আইন অমান্য করে এই

আন্দোলনের সূত্রপাত হল। এতদিন জনসাধারণকে লবণের উপর কর দিতে হত। লবণ তৈরী করাও সম্পূর্ণ বে-আইনী ছিল। লবণ আইন অমান্য করে গান্ধীজী গুজরাটে ডাণ্ডির সমুদ্রোপকূলে লবণ তৈরী করতে উদ্যোগী হলেন। সারা দেশে আবার নতুন প্রাণের জোয়ার দেখা দিল। গান্ধীজী ও তাঁর সহচর নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হলেন। কিন্তু দেশের সর্বত্র ব্যাপকভাবে এই আইন অমান্য আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস হিসাবে উদ্‌যাপিত হল। ধর্মঘট, পিকেটিং প্রভৃতি দ্বারা ইংরেজ শাসনতন্ত্রকে প্রায় অচল করে দেওয়া হল। ঘরের মেয়েরাও এই আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করলেন। বাংলার কাঁথি ও তমলুকেও আইন অমান্য আন্দোলন খুব জোরদার ভাবে চলে। ইংরেজ সরকার খুবই কঠোর হাতে এই আন্দোলন দমন করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। বহু জননেতা ও অগণিত স্বেচ্ছাসেবককে কারারুদ্ধ করে রাখা হল। তৎসত্ত্বেও আন্দোলনকে স্তব্ধ করা গেল না। গান্ধীজী লণ্ডনে গোল-টেবিল বৈঠকে যোগ দিয়েও ভারতবাসীর জন্য কোনরূপ উল্লেখযোগ্য শাসনতান্ত্রিক অধিকার আদায় করতে পারলেন না। সাময়িক বিরতির পরে আন্দোলন আবার প্রবল আকার ধারণ করে। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে যুক্ত-প্রদেশে (বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ) কৃষক আন্দোলন শুরু হয়। কৃষকেরা সরকারী খাজনা বন্ধ করে দেয়। জওহরলালকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ হয়। এদিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টা চলতে থাকে।

'ভারত ছাড়' আন্দোলন (১৯৪২খ্রীঃ) : পটভূমিকা : ১৯৩৫ সালে ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট নতুন 'ভারত শাসন আইন' প্রবর্তন করে। এতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৯৩৭ সালে নতুন ভারত শাসন আইন অনুসারে নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। এতে কংগ্রেস নয়টি প্রদেশে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে ও মন্ত্রিসভা গঠন করে। পাঞ্জাবে ও বাংলায় মুসলিম লীগের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। নির্বাচনে কংগ্রেসের অভূতপূর্ব সাফল্য

মুসলিম লীগ নেতা জিন্নাকে আরও কংগ্রেস-বিদ্বেষী করে তুলল। জিন্না কংগ্রেসকে একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলে মনে করতেন। তাঁর মতে—হিন্দুদের হাতে কখনই মুসলমানদের স্বার্থ নিরাপদ নয়। তাই মুসমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে জিন্না চৌদ্দ দফা দাবি উত্থাপন করেন। এই দাবি পাকিস্তান স্থাপনের পথে একদৃঢ় পদক্ষেপ। ১৯৩৯ সালে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল—(১) সুভাষচন্দ্রে কংগ্রেস ত্যাগ ও 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামে নতুন রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা এবং (২) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত। বড়লাট লর্ড লিনলিথগো কংগ্রেসের মতামত গ্রহণ না করেই ভারতকে যুদ্ধে নামালেন। এতে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অতিশয় ক্ষুব্ধ হন। কংগ্রেস ঘোষণা করল—ভারতকে গণতান্ত্রিক স্বাধীন দেশ হিসাবে স্বীকৃতি না দিলে ভারত এই যুদ্ধে যোগ দেবে না। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্নে বড়লাট সম্পূর্ণ নীরব রইলেন। সরকারী মনোভাবে কংগ্রেস বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করল। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে মুসলমানদের জন্য একটা পৃথক রাষ্ট্র 'পাকিস্তান' দাবি করা হয়। এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে ইংলণ্ডের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠতে থাকে। জাপানী সৈন্যগণ সিংগাপুর ও ব্রহ্মদেশ অধিকার করে। এতে ইংরেজদের ভারতে সাম্রাজ্য রাখা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ভারতীয় জনমতের সমর্থন প্রয়োজন হয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা প্রায় অচল করে দেয়। এই অবস্থায় বিপদ বুঝে ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী তখন স্টাফোর্ট ক্রীপসকে ভারতে প্রেরণ করেন। কিন্তু ক্রীপসের আপোষ প্রস্তাব মুসলিম লীগ বা কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে কোন সাড়া জাগাতে পারল না।



জিন্না



স্টাফোর্ড ক্রীপস্

ভারত ছাড় আন্দোলনের যথার্থ রূপ : ক্রীপস্ মিশনের ব্যর্থতা এদেশবাসীর মনে চরম হতাশা ও বিরূপতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় গান্ধীজী তাঁর তৃতীয় পর্যায়ে ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু করলেন। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু হয়েছিল বলে এই আন্দোলনকে 'আগস্ট আন্দোলন'ও বলা হয়। গান্ধীজী পরিষ্কার ভাবে দেশবাসীকে জানালেন যে, ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান হলেই জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনা দূর হবে। তাই তিনি ঘোষণা করলেন, 'ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়,' 'করেঙ্গিয়া মরেঙ্গে' অর্থাৎ 'ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করব নচেৎ প্রাণ দেব'। ভারতের প্রায় সর্বত্র 'ভারত ছাড়' আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। ৯ই আগস্ট গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতাদের গ্রেপ্তার করা হল। ইংরেজ সরকার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করলেন। তৎসত্ত্বেও এই আন্দোলনের গতিকে স্তব্ধ করতে পারলেন না। এর প্রতিবাদ স্বরূপ সারা ভারত ব্যাপী গণ-বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করল। রেলস্টেশন, সরকারী অফিস ও থানা ভস্মীভূত হল। 'ভারত ছাড়' আন্দোলন বাংলার মেদিনীপুর জেলাতেও তীব্র আকার ধারণ করেছিল। ৭৩ বছরের বৃদ্ধা মতাঙ্গিনী হাজরা শোভাযাত্রার পুরোভাগে অংশ গ্রহণ করে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারালেন। বহু নরনারী আহত ও নিহত হল। ইংরেজ সরকার পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার সঙ্গে এই আন্দোলন দমনের চেষ্টা করেও তা থামাতে পারলেন না। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ সৈনিক হলেন ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে অবস্থিত অফগানিস্তানের খান আবদুল গফুর খান। গান্ধীজীর সত্য, ন্যায় ও অহিংসাই ছিল তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র। এজন্য তাঁকে বলা হয় 'সীমান্তের গান্ধী'। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'খোদাই খিদমৎগার' নামক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আন্দোলন শুরু করেছিল। এই আন্দোলন ক্রমশঃ



খান আব্দুল গফুর খান

তীব্রতা লাভ করে। এই আন্দোলনের ফলে ভারতের জনগণ স্বাধীনতার দিকে আর এক ধাপ অগ্রসর হল।

সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ ফৌজ : ১৯৪২ সালে যে সময় ভারতে আগস্ট আন্দোলন চলছিল ঠিক সেই সময় বিদেশে বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ব্যবস্থা করছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি বৃটিশ বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকার জন্য গ্রেপ্তার হন এবং পরে অসুস্থতার জন্য নিজ গৃহে নজর বন্দী থাকেন। ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারী পুলিশের কড়া পাহারা এড়িয়ে তিনি প্রথমে আফগানিস্তান ও পরে রাশিয়া হয়ে জার্মানি যান। তাঁর জার্মানিতে যাওয়ার উদ্দেশ্য হল, জার্মানি ও জাপানের সাহায্য নিয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা। জার্মানিতে তিনি হিটলারের সঙ্গে আলোচনা করে সেখানে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে এক ভারতীয় বাহিনী গঠন করলেন। এটাই হল আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের প্রথম পরিকল্পনা।


নেতাজী

ইতিমধ্যে মালয়, সিংগাপুর ও ব্রহ্মদেশ জাপানের পদানত হল। সিংগাপুরে জাপানীদের হাতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে ক্যাপ্টেন মোহন সিং ও বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে বিখ্যাত আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠা হল। রাসবিহারী বসু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াস্থিত ভারতীয়দের নিয়ে 'ভারতীয় জাতীয় সংঘ' স্থাপন করেন। তিনি সুভাষচন্দ্রকে সেখানে উপস্থিত হবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। সুভাষচন্দ্রের আগমনের সংগে সংগে রাসবিহারী বসু ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের দায়িত্ব এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করলেন। সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজকে ঢেলে সাজালেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি সেনানীরা তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্ব আন্তরিকভাবে

স্বীকার করে নিল। তারা তাঁকে 'নেতাজী' আখ্যায় ভূষিত করল। নেতাজী তাদের ধ্বনি দিলেন, 'জয় হিন্দ,' 'দিল্লী চলো'। ১৯৪৪ খ্রীঃ জাপানীদের সহযোগীতায় যুদ্ধ করতে করতে আজাদ হিন্দ ফৌজ সর্বপ্রথম বর্মা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা ভারতের মাটিতে উত্তোলন করল। মণিপুরের কোহিমা পর্যন্ত এ বাহিনী অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৩-৪৪ সালে বিশ্বযুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। জাপান মিত্রশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করলে আজাদ হিন্দ ফৌজের দুর্যোগ ঘনিয়ে এল। এ পরিস্থিতিতে বৃটিশ বাহিনীকে প্রতিহত করা সম্ভব হলনা। আজাদ হিন্দের কয়েকটি দল বীরত্বের সংগে যুদ্ধে প্রাণ দিলেও পরে অবশিষ্ট দলকে আত্মসমর্পণ করতে হল। কিছুকাল পর বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর খবর পাওয়া গেল, কিন্তু এর সত্যতা সম্বন্ধে এখনও অনেক সন্দিহান।

জনমনে প্রতিক্রিয়া ঃ সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে তা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। আপাত দৃষ্টিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে বটে, কিন্তু তার দুঃসাহসিক পরাক্রম, গভীর দেশপ্রেম ও নিঃস্বার্থ ত্যাগ ভারতবাসীর মনে রেখাপাত করে। ফৌজের কৃতিত্বে ভারতবাসীর আত্মমর্যাদা বেড়ে যায় এবং তাদের স্বাধীনতার আকাংখা তীব্রতর হয়। ফৌজের সেনানীদের মৃত্যুপণ সংগ্রাম ভারতের বিপ্লবীদের দারুণভাবে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে। অপরদিকে ফৌজের দেশপ্রেম, সংগঠনী প্রতিভা ও বীরত্ব বৃটিশ শাসকগণকে রীতিমত শংকিত করে তোলে। ভারতীয় সৈন্যদের উপর আর যে আদৌ আস্থা রাখা যায় না বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করলেন। তাই নেতাজী ও তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনীর আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেম যে ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আজাদ হিন্দ ফৌজের কীর্তি-কাহিনী সর্ব শ্রেণীর সেনাদলের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। শীঘ্র এর প্রমাণ পাওয়া গেল। ১৯৪৬ সালে বোম্বাই-এর নৌ-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভারতীয় নৌ-সেনাগণ বিদ্রোহ

ঘোষণা করল। 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো' এই ধ্বনি তুলে বিদ্রোহীরা শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। এতে বৃটিশ সরকার খুব আতংকিত হলেন এবং এই বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে কঠোর নীতি গ্রহণ করলেন। অবশেষে মহাত্মা গান্ধীর কথায় বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করে ও পরে মুক্তি পায়।

ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভারতের স্বাধীনতা লাভ : পটভূমিকা : ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের তীব্রতা, বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা ও নৌ-বিদ্রোহের প্রভাব ইংরেজদের পক্ষে ভারতে সাম্রাজ্য বজায় রাখা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনীর অগ্রগতি ইংরেজদের ভারত-সাম্রাজ্যের ভিত্তি কাঁপিয়ে দিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পরে শ্রমিক দলের নেতা স্যার এ্যাটলী ভারত সচিব স্যার পেথিন লরেন্স, স্টাফোর্ড ক্রীপস ও আলেকজাণ্ডারকে ভারতে পাঠালেন। এই প্রতিনিধি দলের তিন জনই ছিলেন ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার সদস্য। সেজন্য একে ক্যাবিনেট বা 'মন্ত্রি মিশন' বলা হয়। ১৯৪৬ সালে ২৪শে মার্চ ক্যাবিনেট মিশন দিল্লীতে এসে উপস্থিত হল। এই মন্ত্রি মিশনের ভারত আগমনের উদ্দেশ্য ছিল এদেশের রাজনৈতিক নেতাদের সংগে আলোচনা করে স্বাধীনতার প্রশ্নে চূড়ান্ত মীমাংসায় উপনীত হওয়া। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রতিনিধিদের সংগে মন্ত্রি মিশনের সদস্যদের আলোচনা হল। জিন্না সহ মুসলিম লীগের নেতারা কিছুটা অনমণীয় মনোভাবের পরিচয় দিলেন। মন্ত্রিসভা একটি সংবিধান গঠনের প্রস্তাব দিল। যে পর্যন্ত না সংবিধান রচিত হয় সেই সময় পর্যন্ত ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। মন্ত্রি মিশনের প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। লীগ নেতারা সংবিধান সভার নির্বাচন বয়কট করে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে পা বাড়ালেন। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট বাংলা ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাংগা শুরু হল। এই দাংগার প্রধান রংগভূমি হল কলিকাতা মহানগরী। গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতাদের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত এই

সর্বনাশা দাঙ্গা বন্ধ হয়। এই সময়ে লর্ড ওয়াভেল ইংলণ্ডে ফিরে গেলেন এবং লর্ড মাউণ্টব্যাটেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন।

ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভারতের স্বাধীনতা : সাম্প্রদায়িক দাংগা-হাংগামার ফলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। কূটনীতিবিদ বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন এই অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করলেন যে ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হবে এবং মুসলমান-প্রধান অঞ্চলগুলিকে নিয়ে একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠিত হবে। এর ফলে মুসলিম লীগ নেতা জিন্নার 'পাকিস্তান দাবি' স্বীকৃতি পেল। জিন্নার কার্যকলাপে নিরুপায় হয়ে অবশেষে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও এতে সম্মতি জানালেন। অখণ্ড ভারত এরপর থেকে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি ভিন্ন রাষ্ট্রে চিরদিনের মত খণ্ডিত হয়ে গেল। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে ১৯৪৭ সালের ৫ই জুলাই একটি ভারত স্বাধীনতা সংক্রান্ত আইন অনুমোদিত হল। এই আইনে স্থির হল যে, ভারত ও পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্র গঠন করে ভারতবাসীর হাতে বৃটিশ শাসকেরা সমস্ত শাসনভার অর্পণ করবেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান হল এবং ভারত একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হল।



লর্ড মাউণ্টব্যাটন

কালক্রম

অসহযোগ আন্দোলন	১৯২০ খ্রীঃ
সাইমন কমিশন	১৯২৭ খ্রী
লাহোর কংগ্রেস	১৯২৯ খ্রীঃ
আইন-অমান্য আন্দোলন	১৯৩০ খ্রীঃ
'ভারত ছাড়' আন্দোলন	১৯৪২ খ্রীঃ
ভারতের স্বাধীনতা লাভ ১৫ই আগস্ট,	১৯৪৭ খ্রীঃ

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল বর্ণনা কর।

২। আইন-অমান্য আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ।

৩। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ।

৪। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অবদান বর্ণনা কর।

৫। ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভারতের স্বাধীনতা লাভ সম্পর্কে কি জান?

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। অসহযোগ আন্দোলনের কারণ কি?

২। অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী কি ছিল?

৩। সাইমন কমিশন সম্পর্কে কি জান?

৪। আইন-অমান্য আন্দোলনে জওহরলাল নেহেরুর ভূমিকা উল্লেখ কর।

৫। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে মাতঙ্গিনী হাজরার ভূমিকা কিরূপ ছিল?

৬। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভারতের জনমনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল?

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। দু'এক কথায় উত্তর দাও—

(ক) গান্ধীজী কত খ্রীষ্টাব্দে ভারতের রাজনীতিতে যোগদান করেন?

(খ) অসহযোগ আন্দোলন কবে শুরু হয়েছিল?

(গ) সাইমন কমিশন কবে গঠিত হয়?

(ঘ) লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি কে ছিলেন?

(ঙ) আইন-অমান্য আন্দোলন কবে শুরু হয়েছিল?

(চ) 'ফড়োয়ার্ড ব্লক' কে গঠন করেছিলেন?

(ছ) 'ভারত ছাড়' আন্দোলন কবে শুরু হয়েছিল?

(জ) 'সীমান্ত গান্ধী' কাকে বলা হয়?

(ঝ) আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন?

(ঞ) ভারত কবে স্বাধীনতা লাভ করে?

সপ্তদশ অধ্যায়

॥ চীনের বিপ্লব ॥

(১৯১১—১৯৪৯ খ্রীঃ)

ইউ-য়ান্-সিকাই ও সান্-ইয়াৎ সেনের অন্তর্কলহে প্রজাতন্ত্রে ভাঙ্গন : দশম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে সান-ইয়াৎ-সেন স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করলে ইউ-য়ান-সিকাই প্রজাতান্ত্রিক চীনের রাষ্ট্রপতির পদে বসেন। কারণ সান্-ইয়াৎ-সেনের ধারণা ছিল যে ইউ-য়ান্-সিকাই-এর নেতৃত্বে দেশের উন্নতি হবে। কিন্তু তাঁর সে আশা পূর্ণ হল না। প্রজাতন্ত্রের উপর ইউ-য়ান্-সিকাই-এর মোটেই বিশ্বাস ছিল না, রাজতন্ত্রের দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী। বিদেশীদের দ্বারা সাহায্য পুষ্ট হয়ে তিনি চীনের সম্রাট হয়ে বসেন। আদর্শগত বিভেদের ফলে শীঘ্রই ইউ-য়ান্-সিকাই এবং সান্-ইয়াৎ-সেনের মধ্যে অন্তর্কলহ শুরু হল। এই অন্তর্কলহের ফলে চীনে প্রজাতন্ত্রের ভাঙ্গন দেখা দিল। ইতিমধ্যে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউ-য়ান-সিকাই-এর মৃত্যু হয়। ইউ-য়ান্-সিকাই-এর মৃত্যুর পর ডাঃ সান দক্ষিণ চীনের ক্যাণ্টনে প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে চীনের উত্তরাঞ্চলেও একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সরকারের অস্তিত্ব ছিল।

তু-চুনদের কবলে চীন : চীন প্রজাতন্ত্রের এই দুর্বলতা ও অনৈক্যের সুযোগে মাঞ্চু আমলের বহু সেনাপতি নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবে শাসনকার্য চালাতে থাকে। তাদের বলা হত তু-চুন বা সমর-নায়ক। চীনের উত্তরাঞ্চলেই এদের প্রাধান্য ছিল বেশী। এরা বিদেশীদের অর্থসাহায্যে চীনের অভ্যন্তরে নানারূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে লাগল।

সান্-ইয়াৎ-সেনের কুয়োমিন্ তাঙ ও তার তিনটি মৌলিক নীতি : দেশের এই পরিস্থিতিতে এগিয়ে এলেন সান্-ইয়াৎ-সেন। তিনি দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপনের জন্য একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করলেন। এই দলের নাম ছিল 'কুয়োমিন্ তাঙ' অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী দল। তিনি ছিলেন চীনের 'কুয়োমিন্ তাঙ' দলের নেতা। সান্-ইয়াৎ-সেন মনে করলেন, রাশিয়ার সাহায্য ছাড়া দেশকে কখনও শক্তিশালী করা সম্ভব নয়। তাই রাশিয়ার পরামর্শে ও সাহায্যে তিনি তাঁর দলকে শক্তিশালী করলেন।

তিনি দেশকে ঐক্যবদ্ধ করবার উদ্দেশ্য 'কুয়োমিন্ তাঙ্' দলের নীতি নির্ধারণ করেন। এই দলের প্রথম নীতি হল—জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ লোপ। পাশ্চাত্য জাতিগুলির সঙ্গে সমান অধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় মর্যাদার পুনঃ প্রতিষ্ঠাই ছিল সান-ইয়াৎ-সেনের মূল লক্ষ্য। এই দলের দ্বিতীয় নীতি ছিল—গণতন্ত্র। অর্থাৎ জনসাধারণের ভোটে দেশের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। কৃষিও শিল্পের উন্নতি সাধন করে জনসাধারণের জীবিকার ব্যবস্থা করা—এই ছিল দলের তৃতীয় নীতি। কুয়োমিন্ তাঙ্ দলের এই সব মৌলিক নীতি দেশের জনসাধারণে মধ্যে বেশ উৎসাহের সাড়া জাগায়। কিন্তু সান্-ইয়াৎ-সেনের চেষ্টা সত্ত্বেও চীনে ঐক্যবদ্ধ গণতন্ত্রী সরকার গঠিত হতে পারেনি। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

৪ঠা মের আন্দোলন ঃ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভার্সাই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চীনের শাণ্টুং প্রদেশটি জাপানের হাতে ছেড়ে দিতে বলা হয়। কিন্তু চীন সরকার এতে কোন আপত্তি জানায় নি। তারই প্রতিবাদে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে তুমুল আন্দোলন শুরু করে। তারা চীনের তিনজন অপদার্থ মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে এবং তাদের ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দেয়। ক্রমে এই আন্দোলন সাংহাই প্রভৃতি শহরের কল কারখানা গুলিতেও ছড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত চীন সরকার ভার্সাই সন্ধিকে স্বীকৃতি না জানাতে এবং তিনজন মন্ত্রীকে পদত্যাগ করাতে বাধ্য হন।

কুয়োমিন-তাঙ্ দল ও চীনের কমিউনিস্ট দলের মধ্যে সম্পর্ক (১৯২১—১৯২৪ খ্রীঃ) :—সান্-ইয়াৎ-সেন কর্তৃক কুয়োমিন্ তাঙ্ দল গড়ার কয়েক বছরের মধ্যেই চীনে কমিউনিস্ট দলও গঠিত হয়। সোভিয়েট রাশিয়া থেকে কয়েকজন পরামর্শদাতা চীনে আসেন এবং তাঁদের পরামর্শ অনুসারেই প্রথমে সাংহাই শহরে কমিউনিস্ট দল গড়ে ওঠে (১৯২০ খ্রীঃ)। ধীরে ধীরে এই দলের সমর্থক সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তারা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সান্-ইয়াৎ-সেন প্রথম দিকে কমিউনিস্ট বিরোধী ছিলেন। কমিউনিস্টরা তখন গোপনে তাদের কাজকর্ম চালিয়ে

যেত। পরে অবশ্য সান্-ইয়াৎ-সেনের সংগে কমিউনিস্ট দলের সদ্ভাব স্থাপিত হয়। তখন কমিউনিস্টরা কুয়োমিন্ তাঙ্ দলের সদস্য হতে পারত। কমিউনিস্ট দলে কৃষক, শ্রমিক ও প্রগতিশীল ছাত্রদের সংখ্যাই ছিল বেশী। কুয়োমিন্-তাঙ্ দলের সঙ্গে তাদের মিশে যাওয়ার ব্যাপারটা দেশের অভিজাত শ্রেণীর লোকদের চোখে মোটেই ভাল লাগল না। তবু এইভাবেই কয়েক বছর কাটল। পরে আদর্শগত ব্যাপারে এই দুই দলের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল।

চিয়াং-কাইশেকের দমনমূলক নীতিঃ সান্-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য চিয়াং কাইশেক কুয়োমিন্-তাঙ্ দলের নেতা হলেন। ক্ষমতা লাভ করেই চিয়াং-কাইশেক বহুধা-বিভক্ত চীনকে ঐকবদ্ধ্য করতে চেষ্টা করেন। চিয়াং ছিলেন দেশের অভিজাত শ্রেণীর লোকদের সমর্থক। তিনি জমিদার, ব্যবসায়ী শ্রেণী ও বিদেশী শিল্পপতিদের নানারকম সুযোগ সুবিধা দিতেন। কিন্তু কমিউনিস্টদের এতে ঘোর আপত্তি ছিল। ফলে কমিউনিস্টদের সঙ্গে চিয়াং কাইশেকের প্রকাশ্য বিরোধ আরম্ভ হল। কমিউনিস্টদের দমন করবার জন্য চিয়াং ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। তিনি কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে পরপর কয়েকটি অভিযান চালান। বহু কমিউনিস্টকে গ্রেপ্তার করা হল। সশস্ত্র বাহিনী দিয়ে তিনি কমিউনিস্ট অধিকৃত চীনের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ঘেরাও করে ফেলেন এবং নানকিং দখল করে নেন।



চিয়াং-কাইশকে

কমিউনিস্টদের দীর্ঘ অভিযান ঃ চিয়াং কাইশেক যখন কমিউনিস্টদের উপর চরম উৎপীড়ন শুরু করলেন ঠিক সেই সময়ে কমিউনিস্টদের মধ্যে একজন বিখ্যাত নেতার আবির্ভাব হয়। তিনি হলেন মাও-সে-তুঙ্। মাও-সে-তুঙ্ হুনান প্রদেশের এক কৃষকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি হুনান প্রদেশের চাষীদের নিয়ে একটি বিপ্লবী ফৌজ গঠন করেছিলেন। তারা গেরিলা যুদ্ধে পারদর্শী ছিল। চিয়াং-এর আক্রমণ থেকে রক্ষা

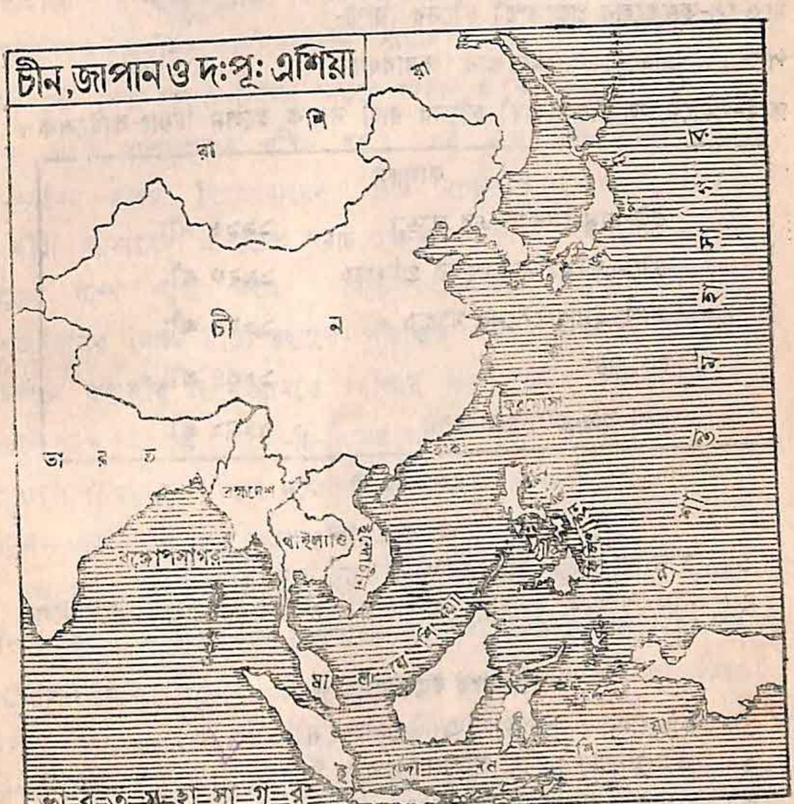
পাবার জন্য তিনি তাঁর দলবল নিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যাবার পরিকল্পনা করলেন। তাঁর নেতৃত্বে প্রায় লক্ষাধিক কমিউনিস্ট চীনের কিয়াংসি অঞ্চল ছেড়ে উত্তর-পশ্চিমে শেনসি প্রদেশের দিকে রওনা হল। দুশো আটষট্টি দিন ধরে তারা প্রায় ৬০০০ মাইল পায়ে হেঁটে দীর্ঘ অভিযান করেছিল। এই অভিযান ইতিহাসে 'লং মার্চ' নামে বিখ্যাত। এইভাবে শেনসি অঞ্চলে গিয়ে কমিউনিস্টরা নতুন করে সংগঠিত হতে লাগল।

সিয়াং-ফুর ঘটনা (১৯৩৬ খ্রীঃ)—চিয়াং ও মাও-এর মধ্যে ঐক্যমত গঠনের প্রচেষ্টা :—এদিকে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীনের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে বসল। শীঘ্রই জাপান মাঞ্চুরিয়াকে চীন থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিল। চিয়াং এদিকে কোনরকম দৃষ্টিপাত করলেন না। কারণ তিনি তখন কমিউনিস্টদের দমন করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। সুযোগ বুঝে জাপানীরা পরে যখন চীন আক্রমণ করল, তখন চীনের এই বিপদে কমিউনিস্টরা কিন্তু চিয়াং কাইশেকের দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁরই নেতৃত্বে জাপানী আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে চেয়েছিল। চিয়াং কিন্তু এতেও কোন সাড়া দিলেন না। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। চিয়াং-কাইশেকের কমিউনিস্টপন্থী কর্মচারীগণ তাঁকে দু' সপ্তাহকাল সিয়ান-ফুর সেনানিবাসে বন্দী করে রাখল। এই কাজে কমিউনিস্টদের সাহায্য করেছিল চিয়াং-এর একজন সেনাপতি। বন্দী অবস্থায় চিয়াং-এর উপর চাপ সৃষ্টি করা হল যে, তিনি যদি কমিউনিস্টদের সঙ্গে যৌথ ভাবে জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করবেন বলে কথা দেন, তাহলেই তাঁকে বন্দিশালা থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। চিয়াং বাধ্য হয়ে কমিউনিস্টদের সঙ্গে সন্ধি করেন এবং কমিউনিস্টদের সঙ্গে অন্তর্যুদ্ধ মিটিয়ে ফেলেন।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে চীনের উপর জাপানী আক্রমণ চলছে। এইবার তার উপযুক্ত জবাব দেওয়ার সময় এসেছে। জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে চিয়াং ও মাও-এর মধ্যে ঐক্যমত স্থাপিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ—জাপানের চীন আক্রমণ :—১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে। এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

শুরু হলে সোভিয়েট রাশিয়া এবং আমেরিকা চীনকে অস্ত্র সাহায্য দেয়। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পক্ষে অস্ত্রধারণ করে। ফলে চীন-জাপান যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে মিশে যায়। জাপানের এই আক্রমণাত্মক নীতি চীনাবাসীদের স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। দেশ রক্ষার জন্য তারা যুগ্মভাবে যুদ্ধ করতে থাকে। ফলে জাপান এই যুদ্ধে পরাজিত হয়। এবং চীনের জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।



গৃহযুদ্ধ ঃ ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হলে কুয়োমিন্-তাঙ্ ও কমিউনিস্টদের মধ্যে পুনরায় গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। চিয়াং-এর সঙ্গে মাও-সে-তুঙ-এর কয়েক দফা যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে চিয়াংকে আমেরিকা অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিল। তবু তিনি সাফল্য লাভ করতে পারেননি।

দুই চীন : এই গৃহযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত কুয়োমিন্-তাঙ দলের পরাজয় ঘটলে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তারা ফরমোজা (অধুনা তাই-ওয়ান) দ্বীপে বহিষ্কৃত হয়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মাও-সে-তুঙ্ চীনের মূল ভূখণ্ডকে 'জনগণের প্রজাতন্ত্র' বলে ঘোষণা করেন। মাও-সে-তুঙ্ হলেন প্রজাতন্ত্রী চীনের রাষ্ট্রপতি। এদিকে আমেরিকার তত্ত্বাবধানে তাই-ওয়ানে জাতীয়তাবাদী চীনের রাষ্ট্র নায়ক হলেন চিয়াং-কাইশেক।



মাও-সে-তুঙ্

কালক্রম	
ইউ-য়ান-সিকাই-এর মৃত্যু	১৯১৬ খ্রীঃ
চীনে কমিউনিস্ট দলের প্রতিষ্ঠা	১৯২০ খ্রীঃ
সান্ ইয়াৎ সেনের মৃত্যু	১৯২৫ খ্রীঃ
লং মার্চ	১৯৩৪ খ্রীঃ
চীন প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা	১৯৪৯ খ্রীঃ

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। চীন বিপ্লবের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ।
২। মাও-সে-তুঙ্ কিভাবে প্রজাতন্ত্রী চীনের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। কুয়োমিন তাঙ্ দলের তিনটি মৌলিক নীতি কি কি?
২। কমিউনিস্টদের দীর্ঘ অভিযান সম্বন্ধে কি জান?
৩। ৪ঠা মের আন্দোলন বলতে কি বোঝ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। দু'এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) সান-ইয়াৎ সেন কবে মারা যান?

(খ) চীনে সর্বপ্রথম কোথায় এবং কবে কমিউনিস্টদের দল গঠিত হয়?

(গ) চিয়াং-কাইশেক কে ছিলেন?

(ঘ) কার নেতৃত্বে 'লং মার্চ' হয়েছিল?

অষ্টাদশ অধ্যায়

॥ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিপ্লব ॥

(১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে)

ইন্দোচীন ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জাপান ইন্দোচীনে ফরাসী সাম্রাজ্যের অবসান ঘটায়। জাপানের পতনের পরে ইন্দোচীনের কাম্বোডিয়া, লাওস ও ভিয়েৎনাম স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এদিকে ফ্রান্স ইন্দোচীনে তার পূর্ব সাম্রাজ্য ফিরে পেতে চেষ্টা করে। ফলে ইন্দোচীনে ফ্রান্সের সঙ্গে স্বাধীনতাকামীদের দীর্ঘ সংগ্রাম আরম্ভ হয়। ইন্দোচীনের কমিউনিস্ট নেতা হো-চি-মিনের নেতৃত্বে আনাম ও কোচিন চীন ও টনকিন নিয়ে একটি সাধারণতন্ত্র গঠিত হয়। এর নাম হল ভিয়েৎনাম। হো-চি-মিন হলেন ভিয়েৎনামের প্রথম রাষ্ট্রপতি (১৯৪৫ খ্রীঃ)। ফরাসীরা আনামের গদিচ্যুত সম্রাট বাও-দাইকে হাত করে ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। দিয়েন-বিয়েন-ফুর যুদ্ধে ফরাসীরা হো-চি-মিনের নিকট চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। অতঃপর জেনেভা সম্মেলনে ফরাসীর ভিয়েৎনামকে স্বীকার করে নেয়। ভিয়েৎনামকে দুভাগে ভাগ করা হয়। হো-চি-মিনের অধীনে রইল উত্তর ভিয়েৎনাম, এর রাজধানী হ্যানয়। আর দক্ষিণ-ভিয়েৎনামের রাজধানী হল সায়গন। এখানেও একটি প্রজাতন্ত্রী সরকার গঠিত হয়।

ব্রহ্মদেশ ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বহ্মদেশ জাপানীদের দ্বারা অধিকৃত হয়। যুদ্ধের পরে ব্রহ্মদেশের অধিবাসীরা জাপানীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। এদিকে ইংরেজরা পুনরায় ব্রহ্মদেশে আধিপত্য স্থাপন করতে অগ্রসর হয়। তখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে ব্রহ্মদেশবাসীদের সংগ্রাম শুরু হয়। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর ব্রহ্মদেশকে আর বেশী দিন ইংরেজদের কবলে রাখা সম্ভব হল না। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী ব্রহ্মদেশ স্বাধীন হয় এবং সেখানে সাধারণতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

মালয়েশিয়া ঃ ব্রহ্মদেশের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত মালয় উপদ্বীপও এক-সময়ে ইংরেজদের অধীন ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সেখানে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে আগস্ট এগারোটি ছোট

ছোট রাজ্য নিয়ে মালয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় এবং এর স্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়া হয়। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর সিংগাপুর, ব্রুনেই উত্তর বোর্ণিও ও সারাওয়াফ অঞ্চল মালয় যুক্তরাষ্ট্রের সংগে সংযুক্ত হয়ে মালয়েশিয়া নামে একটি বৃহত্তর স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট সিংগাপুর মালয়েশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়া ঃ ইন্দোনেশিয়ায় পূর্বে ওলন্দাজদের কর্তৃত্ব ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীরা বহু অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করে। এই অস্ত্রশস্ত্রের জোরেই তারা ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ওলন্দাজদের সংগে বিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট ডাঃ সুকর্ণ ও ডাঃ হাডার নেতৃত্বে ইন্দোনেশীয়গণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। শেষে ইংরেজদের মধ্যস্থতায় ওলন্দাজ সরকার ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর ইন্দোনেশিয়াকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করে। পরে ইন্দোনেশিয়ায় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে ডঃ সুকর্ণ হলেন সেই রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোনেশিয়া সরকারের সংগে কমিউনিস্টদের প্রবল সংগ্রাম হয়। এর ফলে সেখানে কমিউনিস্ট দল নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়। ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্র প্রধান হন সৈন্যাধ্যক্ষ সোহার্তো।

কালক্রম

ভিয়েৎনামের সৃষ্টি	১৯৪৫ খ্রীঃ
ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা	১৯৪৮ খ্রীঃ
ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা	১৯৪৯ খ্রীঃ

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। ১৯৪৫ খ্রীঃ পর থেকে ইন্দোচীনের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী লেখ।
২। ব্রহ্মদেশ ও মালয়েশিয়ার স্বাধীনতা লাভের সম্পর্কে কি জান ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা কিভাবে হয়েছিল ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। দু'-এক কথায় উত্তর দাও :
(ক) ব্রহ্মদেশ কবে স্বাধীনতা লাভ করে ?
(খ) ইন্দোচীনের কমিউনিস্ট নেতার নাম কি ?
(গ) ইন্দোনেশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ?

ঊনবিংশ অধ্যায়

॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে পরাধীন দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও অসন্তোষের প্রসার ॥

পরাধীনতার অভিশাপ কোন জাতির পক্ষেই বেশী দিন সহ্য করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেখা যায় পৃথিবীর অনেক পরাধীন জাতির মধ্যেই অসন্তোষের মনোভাব তীব্র হয়ে ওঠে এবং তারা স্বাধীনতার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়। এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশেই তখন জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের প্রসার ঘটে। আফ্রিকাতে ইটালী, ফরাসী, বেলজিয়াম, পর্তুগাল, ইংলণ্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশগুলির বহু উপনিবেশ ছিল। এইসব উপনিবেশগুলিতে ক্রমে জাতীয়তাবাদ আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। এর ফলে লিবিয়া, সোমালিল্যাণ্ড, ইরিত্রিয়া, মরক্কো, আলজিরিয়া, কঙ্গো, মিশর, সুদান, মোজাম্বিক, ঘানা, নাইজেরিয়া, সোনিয়া, উগাণ্ডা প্রভৃতি বহু দেশ পরাধীনতার অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ করে। বিদেশী শাসনের কবল থেকে মুক্তি পেতে তাদের অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। তাছাড়া বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রই তাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন জানায়। নিকটপ্রাচ্যে প্যালেস্টাইন প্রভৃতি দেশেও জাতীয়তাবাদী মনোভাব তীব্র হয়ে ওঠে। শেষে ইহুদীদের জন্য 'ইসরাইল' নামে একটি পৃথক রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।

অতলান্তিক সনদ ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল আটলান্টিক মহাসাগরে এক জাহাজের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখা। তাঁরা আটটি শর্ত সম্বলিত একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। একে বলা হয় 'অতলান্তিক সনদ'। এই সনদে উল্লেখ ছিল—কোন রাষ্ট্র সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি অনুসরণ করবে না; বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে হবে; বহিরাক্রমণের ভয় থেকে মুক্ত হয়ে প্রত্যেক জাতি উন্নত জীবনযাপনের চেষ্টা করবে; সব জাতির মধ্যে মিত্রতার সম্পর্ক গড়ে

তুলতে হবে ; শ্রমিকদের কল্যাণ সাধন করতে হবে ; মানুষের মৌলিক অধিকার স্বীকার করতে হবে ইত্যাদি। প্রথমে ভারতসহ বিশ্বের ১৬টি রাষ্ট্র এবং পরে আরও ১৯টি রাষ্ট্র এই সনদকে স্বীকার করে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা ও উদ্দেশ্য ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিজয়ী রাষ্ট্রগুলির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যে জাতিসংঘ গঠিত হয়েছিল, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তারই স্থান অধিকার করল। প্রথমে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে পঞ্চাশটি জাতির প্রতিনিধি স্বাক্ষর করেন। এই সনদে সমস্ত জাতির কতকগুলি অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি আছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য হল—বিশ্বে শান্তি স্থাপন করা ; পরস্পরের মধ্যে মিত্রতার সম্পর্ক বজায় রাখা ; প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকার করা ; আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি মেনে চলা এবং মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা ইত্যাদি।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পূর্বেকার জাতিসংঘ অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিশালী। এই প্রতিষ্ঠান অনেকগুলি আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা করেছে এবং বহু অন্যায়-অবিচারের প্রতিকার করেছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। ঐগুলির মধ্যে সাধারণ সভা, নিরাপত্তা পরিষদ, অছি পরিষদ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা ও বিশ্ব ব্যাংক এবং শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক পরিষদ হল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সমাজতান্ত্রিক শক্তির সাফল্য—সমাজতান্ত্রিক ও উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের বিস্তার ঃ শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই সমাজতান্ত্রিক শক্তির আসল উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজতন্ত্রের এই আদর্শ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। জনসাধারণের নিকট সমাজতন্ত্রবাদের আবেদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বেশ কটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। তার মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া, চীন প্রভৃতি অন্যতম।

পরাধীন দেশগুলির সম্পদ আহরণ করবার জন্যই একসময়ে উপনিবেশগুলির উপর তাদের প্রভুদের অন্যায় অবিচার চরম সীমায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। জাতীয়তাবাদের উন্মেষের ফলে আজ পৃথিবীর সর্বত্র উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন বিস্তার লাভ করেছে। সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

ভারতবর্ষও সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী। এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশের উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনে ভারত যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়েছে।

কালক্রম	
অতলান্টিক সনদ	১৯৪১খ্রীঃ
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা অক্টোবর,	১৯৪৫খ্রীঃ

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে পরাধীন দেশগুলিতে কিভাবে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে? আলোচনা কর।

২। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা জান লেখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। অতলান্টিক সনদে কি কি উল্লেখ ছিল?

২। সমাজতান্ত্রিক শক্তির সাফল্য সম্বন্ধে কি জান?

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। দু'-এক কথায় উত্তর দাও:

(ক) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

(খ) একটি শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাম কর।